ইসলাম ইউরোপকে যা শিখিয়েছে

আবদুল মওদুদ



মারুফ



বিচারপতি আবদুল মওদুদ ১ জুন ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি বর্ধমান জেলার খস্তকোষ থানার ওয়ারী গ্রামে। শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন হয়েও শুধুমাত্র নিজের আগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তায় গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে লেখাপড়া করে আইএ পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে বিএ (অনার্স) ও এমএ পাশ করেন। ১৯৩৩ সালে আইন পাশ করেন। ১৯৩৬ সালে বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বিচারক হিসেবে বাংলার বিভিন্ন স্থানে চাকরি করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি কলকাতার আলীপুর কোর্টের বিচারক ছিলেন। এ-সময় তিনি অপশন দিয়ে পূর্ববঙ্গে চলে আসেন এবং পাকিস্তান সরকারের বিচার বিভাগে চাকরি করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা জেলা দায়রা জজ হিসেবে কাজ করার সময় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার বিভাগ আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়ে করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থান করেন। এ-সময় তিনি সরকারি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে জেনেভা ও নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। অবসরগ্রহণের পর তিনি কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং নজরুল একাডেমির সভাপতি হন।



ISBN : 978 984 91468 0 3


মাওলা ব্রাদার্স
প্রকাশনার সাত দশকে

ইসলাম ইউরোপকে যা শিখিয়েছে

আবদুল মওদুদ



মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স



মাওলা ব্রাদার্স প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৪৭

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ৩য় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
দুইশত টাকা মাত্র

অনলাইনে বই কিনুন
www.rokomari.com/mowlabrothers
www.porua.com.bd

ISBN 978 984 91468 0 3

ISLAM EUROPEKE JA SHIKHIECHEY (What Islam taught Europe) by Abdul Moudud. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhrubo Esh. Price Taka Two Hundred only.

ভূমিকা

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, নয়া কালচার গড়ে উঠেছে। পরবর্তী সমাজে বা অন্য দেশে সেই কালচারের ঢেউ লেগেছে এবং তার দোলায় আবার নতুন শিক্ষা সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। দুনিয়ায় সভ্যতার বিকীরণ হয়েছে এই রকম ধাপে ধাপে নানাদেশের বহু মনিষী ও সাধকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে।

খ্রিস্ট-পূর্ব আমলে আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিকাশ কতোখানি হয়েছিলো, আজো তা ঐতিহাসিকের নিকট জিজ্ঞাসার বিষয়। এই রকম প্রাচীন ভারতে ও প্রাচীন চীনদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার যে-টুকরাগুলি আমরা পাই সেসব থেকে সন্দেহ থাকে না যে এই দু'টি দেশে প্রাচীন কালে শিক্ষা ও সভ্যতার ধারা উন্নত স্তরের ছিলো। কিন্তু আজও পর্যন্ত তার পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি এবং তার দরুন মানুষের কল্যাণকর ও উন্নতি বিধায়ক অবদানগুলির কোনটি কোন দেশে প্রথম উদ্ভব হয়েছে, আজো তা তর্কের বিষয়। খ্রিস্ট-পূর্ব আমলের একমাত্র গ্রীক ও রোমান সভ্যতার বিবরণ সম্যকভাবে অধীত হয়েছে, তাদের হাতে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির কতোখানি উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো আমরা তার মোটামুটি একটা পরিচয় পেয়েছি।

খৃস্টোত্তর যুগের প্রথম সাতশো বছর ছিলো পৃথিবীর পক্ষে 'আইয়ামে-জাহেলিয়াত' বা অজ্ঞানতার যুগ। ইউরোপে তাকে Dark Ages বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। তার পরেই হলো অজ্ঞাত, অখ্যাত মরুচারী আরব যাযাবরদের সদর্পে ইতিহাসে পদক্ষেপ। তারা কেবল রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেই ইসলামিস্তানের সীমানা বাড়ায় নি, তাদের বহু মনিষী ও সাধকের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সুগভীর সাধনায় দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো, স্থাপত্য, চিত্র ও চারুকলা, সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যার

অতি উচ্চাংগের বিকাশ হয়েছিলো। অসীম কৌতূহল ও অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তারা প্রাচীন জাতিসমূহের জ্ঞান-সম্পদ ও কালচারের উত্তরাধিকারকে আহরণ করে অনুশীলন ও চর্চার দ্বারা আরো ফলপ্রদ ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো। সারা মধ্যযুগে আরবীরা ও মুসলমানরাই ছিলো বিশ্ব সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক—তার দরুন তারাই ছিলো সে-আমলের খ্রিস্টজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষাদাতা। এ-শিক্ষা তারা গৌরবের সংগেই ইউরোপকে দান করেছিলো এবং তাদের শিক্ষার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে আধুনিক খ্রিস্টজগত দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, ইসলামিস্তানের সংস্পর্শে না এলে এবং মুসলিমদের শিক্ষা-সম্পদ না পেলে ইউরোপের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এতো দ্রুত ও সাফল্যমণ্ডিত হতো না।

যাদের শিক্ষা ও সাধনায় দুনিয়া এতোখানি সমৃদ্ধ হয়েছে, তাদের সাধনা ও দান সম্বন্ধে যতোই আলোচনা হবে, ততোই আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও মনিষার বিকাশ হবে, সন্দেহ নেই। বর্তমানে বাঙালী মুসলমান এক যুগসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন—আপন স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী তারা যতোটুকু জোরের সংগে রাজনীতি ক্ষেত্রে জানাচ্ছে, তার চেয়েও আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়েই তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এই শুভ মুহূর্তে তাদের চোখের সম্মুখে তাদেরই পূর্বতন স্বধর্মীদের কীর্তিকলাপকে তুলে ধরার আবশ্যকতা অনেকখানি রয়েছে—নয়াপথের পথিক এখানে অনেকখানি আলো পাবে, দিশা পাবে।

এই আশা-আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা রচিত হয়েছে। একাজে আমাকে একরকম জোর করেই উৎসাহিত করেছিলেন, আমার বাল্যবন্ধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ। তাঁর উৎসাহ ও সাহায্যের জোরেই আমি একাজে অগ্রসর হই। কতোখানি সাফল্য লাভ করেছি, তার বিচার ভার সহৃদয় পাঠকের উপর রইলো। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে বিশ্বসভ্যতায় ইসলামের স্থান ও প্রভাব নির্ণয় করতে যে ভাষাজ্ঞান ও অধ্যয়নের দরকার তা আমার নেই—এবিষয়ে সম্যক গবেষণা ইউরোপেও আজো পর্যন্ত হয় নি। যে-কয়টা বিক্ষিপ্ত রচনা এবিষয়ে আমার দৃষ্টি ও বিদ্যা গোচর হয়েছে এবং যার উপর ভিত্তি করেই এই গ্রন্থখানা লেখা হলো, তা বহুক্ষেত্রে অপ্রচুর—অনেক প্রশ্নেরই মীমাংসা তাতে পাওয়া যায় না এবং যেখানে পাওয়া যায়, তা যে শেষ সিদ্ধান্ত নয়, তা বলাই বাহুল্য। বিরাট গবেষণাসাপেক্ষ মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার এ অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুসলিম বাঙলার ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক গবেষকদের চেষ্টায় শীঘ্রই এইদিক প্রসারিত হবে, এই আশা ও বিশ্বাসও মনে রইলো।

এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি গত শারদীয়া সংখ্যার 'পরিচয়ে', সাহিত্য প্রবন্ধটা 'ইউরোপীয় সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব' নামে শারদীয়া সংখ্যার 'পরাগে' এবং শেষ প্রবন্ধটি সাপ্তাহিক 'মিল্লাতে' প্রকাশিত হয়েছিলো। এর জন্য আমি এই পত্রিকা তিনটির সুযোগ্য সম্পাদকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। গ্রন্থটির উৎকর্ষ ও সৌষ্ঠব সাধনে আমায় উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন বুন্ধুবর আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কাজি মোহাম্মদ ইদরিস ও জাহরুল হক সাহেবান। প্রচ্ছদ পটটি এঁকেছেন শিল্পী বন্ধু আনওয়ারোল হক। অন্যান্য ব্যাপারে আমি আবু তাহের ও আবদুল করিমের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলকে আমার শোকরিয়া।

বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও প্রুফ সংশোধনে কিছুটা ত্রুটি রয়ে গেলো। আশা করি সহৃদয় পাঠক এ-ত্রুটিটুকু ক্ষমা দিয়ে ঢেকে দেবেন।

ওয়ারি, বর্ধমান
বৈশাখ, ১, ১৩৫৪ সাল

আবদুল মওদুদ

সূচিপত্র

মুসলিম সংস্কৃতির আসল সংজ্ঞা

মুসলিম সংস্কৃতি কথাটির আসল তাৎপর্য গোড়াতেই জেনে রাখা দরকার।

ইসলাম প্রচারিত হওয়ার মাত্র একশো বছরের মধ্যেই ইউরোপ ও আফ্রিকায় মুসলমানরাই সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। সে আমলের বিদিত ভূখণ্ডের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলমানের মোকাবিলা করবার উপযুক্ত আর কোনো রাষ্ট্র বা জাতির অস্তিত্ব ছিলো না। মুসলমানদের সার্বভৌম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সীজার থেকে শুরু করে পারশ্যের খসরু পর্যন্ত স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আধিপত্য বিস্তারের সংগে সংগে মুসলমান অধিকৃত দেশগুলি কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও শীর্ষস্থান অধিকার করে। যাদুকরের মায়াকাঠির স্পর্শের মতো মুসলিম-শক্তি পুরাতন রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙেচুরে এক নূতন জগত গড়ে তুললো—যার রাজধানী হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, পার্থিব সুখ-সম্পদের আশাস্থল এবং শিক্ষা, তাহজিব ও তমদ্দুনের জ্যোতিঃকেন্দ্র। পারসীক, সিরিয়াক, কপ্‌ট, বার্বার, হিসপানী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশবাসী জ্ঞানী ও সুধীগণ আরবী ভাষার মাধ্যমে মুসলমান-আশ্রিত এই তমদ্দুনের অনুশীলন ও অনুকরণকেই আপন ও উন্নত ভাষায় প্রচারিত হয়েছিলো। এই ভাষার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের দরুন নানাভাবে বিভিন্ন শব্দসৃষ্টিরও সুবিধা ছিলো এবং নব নব শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের উপযোগী বিশিষ্ট শব্দ-চয়নও উদ্ভাবনও সম্ভব হয়েছিলো। গত তেরশো বছর ধরে মানুষের জ্ঞাত সবরকম চিন্তাধারার চর্চা এর মারফতে হয়েছে এবং মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের এমন কিছু নেই যার উৎকর্ষ এর মাধ্যমে করা না হয়েছে। অধ্যাপক আর্চারের ভাষায় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার চেয়েও আরবী নমনীয় এবং শব্দ-সৃষ্টিতে ও উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে পাশ্চাত্যের কোনো ভাষারই এর সংগে তুলনা চলে না। বিশ্ব-সংস্কৃতির বাহন হিসাবে আরবীর স্থান অতি উচ্চে। অধ্যাপক সাপির বলেন, এ-বিষয়ে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পরেই আরবীর স্থান নির্দেশ করতে হয়।

কিন্তু মুসলিম জগতে চিরকাল আরব প্রাধান্য থাকেনি; এবং মুসলিম রাষ্ট্রের আইনত ঐক্য, খেলাফতের নামে এই বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত তার জের টানা চললেও বহু জাতির বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানও এই আরব-নির্ভর সভ্যতার সমর্থক হয়নি। আব্বাসীয় খালিফারা জাতিতে ও ভাষায় শেষ পর্যন্ত আরবী থেকে গেলেও তাঁদের সাম্রাজ্যে আরব প্রাধান্য ধ্বংস হয়েছিলো গোড়াতেই। বাগদাদকে কেন্দ্র করে যে কালচার এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়লো, তার রঙ এবং কিছু দিন পরে তার ভাষাও আরবের প্রতি মমতামাত্র রেখে ইরানাশ্রয়ী হয়ে গেলো। এই সময় থেকে এশিয়ার মুসলমান জগতে জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চার ভাষা হিসাবে আরবী রয়ে গেলেও ফারসীই হলো প্রাচ্য মুসলমানের সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক জীবনের ভাষা ও প্রচলিত, রীতি। এগার শতকের শেষ থেকে মুসলিম জগতে শুরু হলো তুর্কীদের প্রাধান্য—মধ্য এশিয়া থেকে মিসর পর্যন্ত নবদীক্ষিত তুর্কীই ছিলো ইসলামী সভ্যতার ও শক্তির রক্ষক। কিন্তু ইরাণের অনুপ্রবিষ্ট প্রভাব ঘুচাতে চেষ্টা করা দূরের কথা, মুসলমান সভ্যতার ফারসী-করণ এবং তার উৎকর্ষ সাধন তুর্কীদের আমলেই হয়েছিলো বেশী। ওসমান-আলী তুর্কীরাই ফারসী ভাষায় নিহিত এই সংস্কৃতিকে তুর্কী ভাষান্তরিত করে তাকে তুর্কী পোষাকে চালাবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু তার প্রসার এশিয়াব্যাপী কখনই হয়নি, হতেও পারে না। ভারতে, মধ্য এশিয়ায় ও এমনকি চীনেও মুসলমানদের যে তাহজীব, তাতে ক্ষীয়মান আরবী প্রভাব আজো লুপ্ত হয়নি সত্য, কিন্তু ফারসীর প্রভাব অপ্রতিহত রয়েছে আজও।

পশ্চিমে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহে কিন্তু আরবী নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা করবার মতো কোনো শক্তিমান ভাষা বা জাতীয় সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেনি। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন বা মিসরের পূর্বতন হামিটিক মিশ্রিত সেমিটিক অধিবাসীদেরও মধ্যে তেমনি ঐ সব দেশের সেমিটিক গোষ্ঠির ভাষাকে আরবীকরণও সমজাত্যের বলে সহজ ও স্থায়ী হয়েছিলো। উত্তর আফ্রিকা বা নিগ্রো জাতি সমূহেরও মধ্যে স্থায়ীভাবে এই আরবী ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা প্রচলন এর সমকক্ষ অন্য কোনো কালচার ছিলো না বলেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু স্পেন ও সিসিলিতে সামরিক ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে আরবী প্রাধান্য স্থাপিত হলেও ল্যাটিন ভাষা ও খ্রিস্টান ধর্মাশ্রয়ী সভ্যতার নবার্জিত শক্তির কাছে তাকে অবশেষে প্রতিহত হয়ে বিতাড়িত হতে হলো।

ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্তী এই ভূভাগে তাই মুসলিম সভ্যতার বিস্তার ও উৎকর্ষের যুগে আরবীই ছিলো এক মাত্র ভাষা। অবনতির যুগেও এ ভাষার ও তৎসৃষ্ট সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়নি এবং আজো মরক্কো থেকে ইরাক পর্যন্ত মুসলিম

দেশ সমূহে আরবেতর জাতি ও অমুসলমানের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এই ভাষাগত ঐক্যের বাঁধনের জোরেই আরব-ফেডারেশনের পতাকা উঠেছে।

অতএব দেখা যায় যে মুসলমানদের স্বর্ণ-যুগের যে সভ্যতা তা এই আরব ও ইরাণ আশ্রয়ী সংস্কৃতিরই সমষ্টি। এর চর্চা মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, অমুসলমানেরও সাধনা ও অনুশীলন একে বিকশিত ও রূপায়িত করেছে, বিস্তৃতি ও সৌকর্য দিয়েছে। এই সভ্যতার প্রাণশক্তি ছিলো ইসলাম প্রবর্তিত ধর্মবিশ্বাস, সাম্যবাদ এবং তারো চেয়ে কার্যকরী মুক্ত-চেতনা—যার গুণে অজ্ঞাত অখ্যাত মরুচারী যাযাবর ইতিহাসে এমন সদর্পে প্রবেশ করতে পেরেছিলো, বিশ্বের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে উদ্ধার ও আত্মসাৎ করে ফুলে ও ফসলে বিকশিত করে তুলেছিলো। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমন গ্রীক, রোমান ও তার পূর্ববর্তী হিব্রু, ব্যাবিলনীয় ও মিসরীয় সভ্যতার উত্তরাধিকার নিয়েই সমৃদ্ধ হয়েছে, সেই রকম মুসলমানরাও ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহে জাত এবং ইরাণী সভ্যতার মাল মশলাকে আবিষ্কার, আত্মসাৎ ও অনুশীলন করে নতুন ভাবে সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলো। তারপর বহুজাতি ও দেশের মনীষীর সমন্বয়ে এ-সভ্যতা পুষ্ট হয়েছে ও বিশিষ্টরূপ পেয়েছে। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে এর প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই তাই কিছু-না-কিছু প্রাক-ইসলামিক নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থান ও পাত্র থেকে আলাদা করে দেখলে পৃথিবীর কোনো সভ্যতাই একটা অ-ধরা আদর্শ (abstract ideal) ছাড়া আর কিছুই নয়। ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ছাড়া সমস্ত বিশ্ব-সংস্কৃতির সম্বন্ধেই বোধ হয় এই কথা খাটে। কারণ ইতিহাস যুগ থেকে যুগান্তরে ধারাবাহিক ভাবে প্রসারিত, তা আকস্মিক আরম্ভ হয় না। ইসলামের সভ্যতার ধারা অনুসরণ কালে এই কথাটিও ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি স্থান-কাল-পাত্রের প্রভাবমুক্ত একটি আকস্মিক মুঞ্জরন নয়। প্রাচীন-সভ্যতার মাল-মশলা নিয়ে, ইসলামের মুক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত হয়ে বহু জাতির সমবেত সাধনা এবং চেষ্টার ফলে ও মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির প্রাধান্যের যুগে ও ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহারিক ও শিক্ষিত জীবনে সৌন্দর্যবিধান ও জ্ঞান চর্চার যে মাপকাঠি সৃষ্ট হয়েছিলো, তারই নাম হলো মুসলিম সভ্যতা। এই সভ্যতা বিস্তারের সাক্ষাৎ ক্ষেত্র ছিলো দজলা (টাইগ্রীস) ও নীলনদের মধ্যকার ভূভাগ; কিন্তু এর উদ্ভাসিত বৃত্তের সীমা পশ্চিমে পেরিনীজ ও পূর্বে গংগা অকসাসকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এ-সভ্যতার নামকরণ করা হয়েছিলো এর নিদর্শন-বাহকের ভাষা ও জাতি অনুসারে। পূর্ব ইউরোপের গ্রীক সভ্যতাশ্রয়ী বাইজান্টাইন খ্রিস্টান মরুভূমি প্রসূত এ-সংস্কৃতিকে বলা হতো স্যারাসেনিক (Saracenic), কারণ আরব,

সিরিয়ার মরুচারী যাযাবরদের এইটাই ছিলো গ্রীক নাম। আর পশ্চিম ইউরোপ যে জাতির মারফত এর আস্বাদ লাভ করতো তারই নাম অনুযায়ী একে বলা হতো মুরীশ (Moorish)। এই রকম এশিয়াতে এর নাম ছিলো তাজিক, পারসী, অথবা দুই বা ততোধিক বিচিত্র নামের সামঞ্জস্যেও এর পরিচয় দেওয়া হতো। অধ্যাপক জুর্জি বলেন, সিরিয়া ও ইরাকের অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি উর্বর অঞ্চল থেকে এই সভ্যতার বিকীরণ হয় এবং দু'টি প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিস্তৃত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এ সারা-বিশ্বকে এক অপরিশোধ্য সাংস্কৃতিক ঋণভারে আবদ্ধ করে ফেলে। তার একটি শাখার নাম ভূমধ্য সাগরীয় অর্ধচন্দ্রবৃত্ত (Mediterranean Crescent)—যার সীমানা ছিলো

ইউরোপের সংগে যোগাযোগ

দশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপ, আফ্রিকা ও পশ্চিম-এশিয়ার মানচিত্র আঁকা হলে দেখা যাবে যে সে-আমলের এই জনাকীর্ণ ভূখণ্ডে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিলো এবং মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত না হলেও প্রায় সে-সব দেশেই মুসলিম তাহজিব ও তমদ্দুনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো। এই ভূখণ্ডের মধ্যে সর্বত্র রাষ্ট্রনৈতিক একতা না থাকলেও এক ধর্ম ও এক সভ্যতার বন্ধনে যে মানব সমাজ গ্রথিত ছিলো, তার ধর্মীয় কেন্দ্র ছিলো মক্কাশরীফ, আর রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিলো শোভাসম্পদময়ী বাগদাদ নগরী। পশ্চিমে মিসর, সমগ্র স্পেন, সিসিলি ও ক্রীট দ্বীপ-পুঞ্জ পর্যন্ত তার এলাকা নির্দেশ করা যায়। সারডিনিয়া ও কসিকা দ্বীপ এবং ইতালীর দক্ষিণে বারী ও আমাল্‌ফীতে মুসলিম-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আরব দেশের উত্তরে সিরিয়া, আর্মিনিয়া ও ককেশাস শৈলমালার দক্ষিণ-পূর্ব ভূভাগে ইসলামের অধিকার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, মেসোপটেমিয়া, ইরাক ও বর্তমান ইরান আফগানিস্তানে মুসলমানরা স্থায়ীভাবে অধিকার স্থাপন করেছিলো। আরও উত্তরে দজলা নদীর অপর তীরস্থ ভূভাগে এবং খারিজম ও ফরগনার উপত্যকা ইসলামের অধিকারে এসেছিলো। আটশতকে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে মুসলমানরা সিন্ধু দেশেও রাজ্যবিস্তার করেছিলো। কবির কথায় 'পশ্চিমে হিসপানী শেষ, পূর্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ' পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ ইসলামিস্তানে পরিণত হয়েছিলো।

পাশ্চাত্যে বা খ্রিস্টজগতে ইসলামী তাহজিদ ও তমদ্দুন আমদানী হয়েছিলো প্রধানত তিনটি ভৌগলিক যোগসূত্রে—স্পেন, সিসিলি ও সিরিয়ার মারফতে। ইহুদিরা স্পেন ও সিসিলিতে এবং ক্রুসেডার ও সওদাগরেরা সিরিয়ার মধ্য দিয়ে এই আদান-প্রদান কার্যে প্রধান সহায়ক হিসেবে কার্য করেছিলো।

নয় শতকের মধ্যেই স্পেন ও পর্তুগালে ইসলামী বা মুরীশ-সভ্যতা প্রাচ্যের ভাবধারায় উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলো এবং কার্ডোভা, টলোডো, সেভীল ও গ্রাণাডায় পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিলো। উত্তর ইউরোপের জাতিগুলি শক্তি সঞ্চয়ের সংগে সংগে দক্ষিণের এই মুসলিম রাজ্যের সংস্পর্শে প্রধানত এগারো শতকে আসতে বাধ্য হয়—এই সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই পরস্পর ল্যাটিন ও আরবী ভাষা-ভাষীদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘনীভূত হতে থাকে। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম-উত্তর উপকুলবর্তী সমুদয় খ্রিস্টজগতে মূর-শাসিত স্পেনের শিক্ষা ও সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সূর্যালোকের মত দীপ্ত ও প্রতিভাত হতে থাকে। এখানেই বিশ্ববিখ্যাত মূর চিন্তা-নায়ক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসাবিদ ইবনে রুশদ বারো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন; এখানেই ইহুদিরা আরব দর্শনশাস্ত্রের প্রথম শিক্ষালাভ করে, মেমুনাদরা পুরাতন বাইবেলের সংগে আফলাতুনের (Aristotle) সামঞ্জস্য দেখাতে প্রেরণা লাভ করে এবং এখানেই খ্রিস্টজগত বারোশতকে আফলাতুনের শিক্ষার ও সাধনার সংগে সম্যক পরিচয় লাভ করে—তার আগে বোথিয়াসের (Boethius) অনুদিত অর্গানন ছাড়া তাঁর আর কোনো কিছুর সংগেই খ্রিস্টজগত পরিচিত ছিলো না। খ্রিস্টেরা স্পেন দখল করলে টলোডোর মসজিদ-কুতুবখানা তাদের হাতে আসে, এটা তখন খ্রিস্টীয় সুধি-সমাজের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিলো।

সিসিলিতে গ্রীক, ল্যাটিন ও আরব বার্বারদের ভাষা ও শিক্ষার অবাধ আদান-প্রদান চলে। এখানে ইসলাম জগত ও খ্রিস্ট-জগতের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং পরস্পরের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অমৃতময় ফল স্বরূপ এমন একটি মিশ্রসভ্যতার ও ভাবধারার সৃষ্টি হয়, যার বদওলতে ইতালির মারফতে এবং প্রধানত নরম্যান ও হোহেনস্ট্যুফেন বংশীয় মার্জিত শাসক দ্বিতীয় রোজার ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আমলে ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অবদানগুলি ইউরোপ খণ্ডে প্রসার লাভ করে। বারোশতকে স্পেনের টলেডোর মতো তেরো শতকে পালামৌ একটি প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র হয়ে ওঠে; সেখানে আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যাপকভাবে ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হতে থাকে। একাজে ইহুদি সুধি-সমাজই অগ্রণী হন এবং তাঁদের অনেকে বহু আরবী গ্রন্থ হিব্রু ভাষাতেও অনুবাদ করেন। গ্রীক, ল্যাটিন ও আরবী তিনটি ভাষাই সিসিলির সরকারী দফতরে এবং পালামৌর বহু ভাষা-ভাষী অধিবাসীদের জলসায়-মজলিসে লিখিত ও কথিত হতো।

স্পেন ও সিসিলির মতো সিরিয়ার কাছাকাছি কোন শক্তিশালী ও বর্ধিষ্ণু খ্রিস্টীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকায় সিরিয়ার মারফতে খ্রিস্টজগতে ইসলামী সভ্যতার আমদানী বিশেষভাবে হওয়া সম্ভবপর ছিলো না। ইহাই বর্তমান কালের লেখকগণের সিদ্ধান্ত। তার দরুন দার্শনিক বা ধর্মীয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক

ইসলামী সভ্যতার নমুনা সিরিয়ার মারফতে পাশ্চাত্য-জগতে খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু এ-কথা সকলেই স্বীকার করেন যে ক্রুসেডের যুগে তেজারতীর ক্ষেত্রে বহু নয়া নয়া রাস্তা খোলা হয় এবং সওদাগরদের মারফতে লেভাঁর মধ্য দিয়ে ইউরোপ খণ্ডে কৃষি, শিল্প, চারুকলা ও নৌ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরবী নতুন গবেষণা ও অবদান নিশ্চয়ই বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। ক্রুসেডের বদওলাতে যুদ্ধ-বিদ্যায় নানা অভিনব কলা কৌশলও পাশ্চাত্য-জগতে প্রচারিত হয়। ক্রুসেড হচ্ছে খ্রিস্টীয়দের নয়া দুশমন মুসলমানদের বিপক্ষে অনুষ্ঠিত বহু সংগ্রাম ও সংঘাত—অতএব মুসলমানদের সমরকৌশলও এই সময়ে ইউরোপীয়রা অনেকখানি আয়ত্ব করতে বাধ্য হয়েছিলো। শহর অবরোধের নয়া কৌশল, আক্রমণের নতুন নতুন পদ্ধতি ইউরোপীয় যোদ্ধারা সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করে। ক্রসেডের শেষের দিকেই সিরিয়া অথবা ল্যাটিন অধ্যুষিত ইউরোপে বারুদের প্রথম সৃষ্টি হয়—ইহাই বর্তমান কালের সুধিগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। চীনাদের কর্তৃক এর আবিষ্কারের কাহিনী আর সঠিক হিসাবে গৃহীত হয় না। চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বন্দুক নির্মান ও তাতে বারুদের ব্যবহার আরম্ভ হয়। খ্রিস্টীয় তেরশো সালে মার্ক নামীয় জনৈক গ্রীক লিখিত পুস্তকে বারুদ প্রস্তুতের সর্ব প্রথম ইউরোপীয় ব্যবস্থা-পত্র পাওয়া যায়। বেকন্ লিখিত ব্যবস্থা-পত্রের মৌলিকতা সন্দেহজনক। কিন্তু তেরশো সালের কিছু পূর্বে হাসান-অল-রম্মাহ্ নামক একজন যোদ্ধা তাঁর অশ্বারোহণ ও সমর-ক্রীড়া সম্পর্কীয় (অল-ফুরু সিয়াহ ওয়াল-মনাসিব অল-হারবীয়া) পুস্তকে বারুদের অন্যতম প্রধান উপকরণ সোরা সম্পর্কে ও আগ্নেয়াস্ত্র-নির্মাণে তার ব্যবহার সম্বন্ধে এরকম একটি ব্যবস্থা বর্ণনা করেন, যার সংগে মার্ক লিখিত ব্যবস্থা পত্রের অবিকল মিল আছে। এ-থেকে ধারণা হয় যে, বারুদ সৃষ্টিতে মুসলমানদের দাবী অনেকখানি। ইউরোপে বাঁকা-ধনু, ভারী বর্ম ও অস্ত্রের নীচে তুলার গদি ব্যবহার ক্রুসেডের আমল থেকেই আরম্ভ হয়। সিরিয়ায় ফরাসীরা আরবীয় তাম্বুর ও নাকাড়া যুদ্ধ-বাদ্য হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। শিক্ষিত কবুতরের মারফতে যুদ্ধের সংবাদাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ইউরোপীয়রা সিরিয়ায় শিক্ষালাভ করে। অধ্যাপক হিট্টির মতে ইউরোপীয় শিভ্যল্রীর (Chivalry) অনেক কিছুই সিরিয়ার প্রান্তরে উন্নতি লাভ করেছিলো।

ক্রুসেডের আমলে যুদ্ধ-বিগ্রহের পিছনে পিছনে তেজারতিও বেশ প্রসার লাভ করে। ইতালির, বিশেষতঃ ভেনিসের ব্যবসায়ীরা ধর্ম-যোদ্ধাদের সংগে ও পিছনে পণ্য-দ্রব্যের বোঝা নিয়ে আসতো এবং সমগ্র ইউরোপখণ্ডে প্রাচ্যের দুর্লভ ও দুর্মূল্য বিলাস-দ্রব্য ফিরি করে বেড়াতো। কেবল সিরিয়া, আরব ও পারস্যের পণ্য নিয়েই তাদের ব্যবসায় চলতো না, সুদূর ভারত, চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকেও তারা পণ্যদ্রব্য আমদানী করতো। এই তেজারতী অবশ্য আরবীয় প্রাধান্যে চলতো।

দামেস্ক ও বাগদাদের বাজারগুলির পণ্য দ্রব্য যেমন পাশ্চাত্যে দস্তুরমতো বিকিকিনি হতো, সেই রকম ইতালিয় ও অন্যান্য দেশের খ্রিস্টান, ইহুদি ব্যবসাদারেরা মুসলমান সওদাগরদের উপর অনেকখানি নির্ভর করতো।

পথ খোলা হলে কেবল ব্যবসায়ীরা পণ্য দ্রব্যই বহন করে না, আরও অনেকশ্রেণীর লোক সেই পথ বেয়ে দেশ বিদেশের গাছ-গাছড়া ফল-মূল ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী আমদানী রফতানী করতে থাকে। সেই রকম সিরিয়ার পথ বেয়ে লেভাঁর মধ্য দিয়ে ইউরোপ খণ্ডে প্রাচ্যের নানারকম ফসল ও ফল-মূলের এবং তাদের চাষও আমদানী হয়েছিলো। তিসি, খরবুজা, লেবু, তরমুজ, আখরোট, ভুট্টা, ধান, পিয়াজ, রসুন প্রভৃতির চাষ এই সময় মুসলমানদের মারফত ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম-উত্তর উপকূলবর্তী দেশগুলিতে আমদানী হয়েছিলো। খুবানী বহু বৎসর ইউরোপে দামেস্কের কুল হিসাবে পরিচিত হতো। এসব গাছ-গাছড়া, শস্য ও ফল-মূলাদি স্পেন, সিসিলি ও সিরিয়ার তিন দিক দিয়েই ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তার দরুন এই স্থানান্তর কার্যে কোন দেশটি কতোখানি সহায়ক হয়েছিলো বর্তমানে তা নির্ণয় করা শক্ত।

এই রকম সৌখীন ও বিলাস-সামগ্রী চীন, ভারত ও ভারতীয় দীপপুঞ্জ থেকে সিরিয়ার পথ বেয়ে ইউরোপে সওদাগরেরা অজস্র পরিমাণে আমদানী করতো। তার মধ্যে এইগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ—তূলা ও তূলার বস্ত্রাদি, মসুলের মসলিন, বাগদাদের নকশাতোলা রেশমী কাপড়, দামেস্কের নানারকম নকশার কাজ করা মনোহর বস্ত্রাদি ও তারের অলঙ্কার, সারসেনী বস্ত্রাদি, আতলাস-নামীয় সিল্ক-সার্টিন বস্ত্র, কম্বল, গালিচা, লাক্ষা; ফিরোজা, কারমিক ও লাইলাক রঙ; বস্ত্রাদি রঞ্জিত করার প্রণালী এবং হরেক রকম ছাঁচ ও ঔষধ, সুগন্ধি দ্রব্য,নীল ও চন্দন কাঠ। প্রাচ্যের অনুকরণে ইউরোপে এ সব বস্ত্রাদি, গালিচা ও কম্বল তৈরীর বহু কারখানা ইউরোপে গড়ে ওঠে। তার মধ্যে Arras-এ নির্মিত বস্ত্র সমগ্র ইউরোপে সমাদর লাভ করে। আয়না, পাউডার ও নানা রকম অংগ-প্রসাধন দ্রব্যের সন্ধানও এই সময়ে ইউরোপের মহিলা-সমাজ মুসলমানদের কাছ থেকেই পায়। তসবী ও তসবী-দানার ব্যবহার ইউরোপীয়রা এই সময় থেকে করতে শেখে।

প্রাচ্যে আসা-যাওয়ার দরুন ইউরোপীয়রা খাওয়া-দাওয়ায় বহু নয়া আদব কায়দা ও ফ্যাশন অনুকরণ করে। ইতালী ও ভূমধ্যসাগরের উপকুলবর্তী জনবহুল শহর গুলিতে কালক্রমে এই ফ্যাশন ব্যাপক ভাবে উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃক লক্ষ্য করবার যোগ্য। জেরুজালেম ৬৩৮ সন থেকে মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে। তারা অবশ্য খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের জন্য জেরুজালেম খোলা রেখেছিলো এবং তাদিগকে সবরকম ধর্মীয় বিধান পালন করবার সুযোগ ও সুবিধা দান করেছিলো। তার দরুন বহু খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীর বিবরণ থেকে তাদের স্বধর্মী মিসর, সিরিয়া,

মেসোপটেমিয়াবাসীদের সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে এসব বিবরণী থেকে এই সব দেশের ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অতি অল্পই উপাদান মেলে। অন্যদিকে মক্কা-শরীফের কথা আলাহিদা ছিলো। মক্কায় হজ্জ করা সমর্থ মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য হিসাবে বিধান থাকায় এই শহরটি সারা মুসলিম-জগতের কেন্দ্রস্থল ছিলো। এই কেন্দ্রে কেবল ধর্মপিপাসুরাই ভীড় করতো না, নানা পথিক নানা দেশ থেকে সেখানে জ্ঞানলাভের আশায় আসতো এবং অসংখ্য সওদাগরও দেশ-বিদেশের পণ্য নিয়ে হজ্জের মওসুমে সেখানে রীতিমতো ভীড় জমাতো। তার ফলে বিভিন্ন মুসলিম-অধ্যুসিত দেশের মধ্যে বাণিজ্য-গত সংস্রব ও সখ্য সহজেই উৎপন্ন হতো। এই হজ্জকে উপলক্ষ করেই বহু মুসলিম জ্ঞানী ও তীর্থ-পথিক দেশবিদেশের অবস্থা, পথ-বিপথের অবস্থান ও সুযোগ সুবিধা এবং মনঝিল, গঞ্জ, প্রভৃতির সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে তাঁদের বিবরণী থেকে অ-মুসলমান অধ্যুসিত ভূখণ্ড সম্বন্ধে খুব কমই পরিচয় মেলে।

দুনিয়ার ভৌগলিক বিবরণ সমন্ধে কোরআনে উক্ত হয়েছে, আল্লাহ মাটির অভেদ্য প্রাচীর দিয়ে দুই দরিয়াকে পৃথক করে দিয়েছেন (কোরআন সুরা ২৫ আয়ত ৫৫, সুরা ৫৫ আয়াত ১৯-২০)। মুসলিম ভৌগলিকেরা একবার এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—দরিয়া অর্থে ভুমধ্য-সাগর একদিকে এবং ভারত মহাসাগর ও লোহিত-সাগর আর একদিকে। এ-থেকে মুসলমানদের ভৌগলিক জ্ঞান-চর্চার প্রেরণা আছে। তবে মুসলমানরা গ্রীকদের অনুকরণেই বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ভৌগলিক জ্ঞান-চর্চা শুরু করে। টলেমির গ্রন্থখানা আল খারেজিমী ৮৩০ সালে আরবীতে তর্জমা করেন এবং তার সংগে একটি মানচিত্র সংযোজিত করেন। তিনি টলেমির অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর কেতাবে মুসলমান-অধ্যুষিত দেশগুলির বিবরণও যোগ করে দেন। খলিফা আল-মামুনের প্রচেষ্টায় আল-খারেজিমী আরো ঊনসত্তর জন ভূতত্ত্ববিদ সহ দুনিয়ার একটি বাস্তবরূপ (সুরাত-অল-আর্দ) খাড়া করেন—এটাই পরবর্তী কালে পৃথিবীর মানচিত্র-অংকনে মডেল হিসাবে গৃহীত হয়। তাতে পৃথিবীকে আব হাওয়ার তারতম্য অনুযায়ী সাতটি মণ্ডলে (ইকলিম) ভাগ করা হয়েছিলো। মুসলিম জ্যোতির্বিদ আল-ফরগানী, আল-বাত্তানী, ইবনে ইউনুস পরবর্তী কালে অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা ও মণ্ডল বিষয়ে (Zone) বিশেষ গবেষণা করেন এবং তাঁদের সাধনা-লব্ধ ফল খ্রিস্টজগত অকুণ্ঠ-ভাবে গ্রহণ করে।

দশ শতকে মুসলমানদের মধ্যে ভূতত্ব-বিষয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হয়—তার স্থায়ী প্রভাব পরবর্তী যুগে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। আল-ইস্তেখারী, ইবনে-হাওকল, আল-মুকাদ্দসীর নাম ভৌগলিক-সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত।

ইসতেখারী তাঁর কেতাব মাসালিক-অল-মমালিকে প্রত্যেক দেশের রঙীন মানচিত্র সংযোজিত করেন। ইবনে-হাওকল স্পেন পর্যন্ত পর্যটন করেন। আল মুকাদ্দসী স্পেন, সিজিস্তান ও ভারত ব্যতীত সমগ্র ইসলামিস্তান প্রায় বিশ বৎসর ধরে পর্যটন করেন এবং নিজের গ্রন্থে প্রত্যেক দেশের বহু ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। ইয়াকুত-ইবনে-আবদুল্লা ভূতত্ব-সম্পর্কে মুজাম-অল উদাবা নামীয় একখানা সুবৃহৎ আভিধানিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাতে উল্লেখিত স্থান সমূহ আক্ষরিক হিসাবে সাজানো হয় এবং সেগুলির সে আমলের পরিজ্ঞাত সমস্ত ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক ও প্রকৃতি বিষয়ক তথ্য পুংখানুপুংখভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। বারো শতকে আল-ইদরিসী সিসিলির শাসক দ্বিতীয় রোজারের আদেশানুসারে ভূ-তত্ত্ব বিষয়ে এক বিরাট পুস্তক সংকলন করেন—এখানে আধুনিক কালের ভূতত্ববিদদের বিশেষ আদরের সামগ্রী। খ্রিস্ট-ধর্মী রাজা রোজার মুসলমান পণ্ডিত ইদরিসীকে সে আমলের জানা-ও-শোনা দুনিয়ার বিস্তৃত বিবরণ লিখতে ভার দেওয়া থেকেই প্রমাণিত হয় সে-আমলে মুসলমানদের পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব খ্রিস্টজগতে কতোখানি স্বীকৃত হতো। খ্রিস্টজগতে ভূতত্ব বিষয়ে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য দান হচ্ছে প্রাচ্য, সুদূর প্রাচ্য, সুদানী-আফ্রিকা ও রাশিয়ার ঘন-বনানী সমাকীর্ণ অনুর্বর অঞ্চলসমূহের বিস্ময়কর বিবরণগুলি। মানচিত্রাংকন বিশেষত ভূচিত্র এবং দেশীয় ও প্রাদেশিক মানচিত্র-অংকন-বিদ্যা আরবীয়রাই ইউরোপীয়দিগকে প্রথমে শিক্ষা দান করে। খ্রিস্টজগতে এজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে প্রধানত স্পেন ও সিসিলির মারফত।

মুসলমানদের তেজারত স্থল পথ ও জলপথে চলতো। নয় শতকের মধ্যে তারা নৌ-চালনায় পারদর্শী হয়ে উঠে এবং তাদের নৌ-বহর ভূমধ্যসাগরে, লোহিত সাগরে ও ভারত মহাসাগরে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ভারত মহাসাগরই তাদের দুঃসাহসিকতা ও অভিযানের প্রধান ক্ষেত্র ছিলো। তার মধ্যস্থ সমস্ত দ্বীপে তাদের চলাচল ও তার উপকূলবর্তী সকল দেশের বন্দরে তাদের অবাধ গতি ছিলো। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডি-গামা আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলে উপস্থিত হলে একজন আরবীয় নৌ-চালকের সংগে তাঁর পরিচয় হয়, তার নাম ছিল আহমদ-ইবনে-মজিদ। পর্তুগীজদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে ইবনে-মজিদের কাছে একখানি উৎকৃষ্ট দরিয়ার মানচিত্র ও নৌ-চালনার বিশিষ্ট যন্ত্রপাতি ছিলো। তারই প্ররোচনায় ভাস্কো-ডি-গামা ভারত অভিমুখে অভিযান করেন এবং সে-ই তাঁকে ভারতের পথ দেখিয়ে এনেছিলো। স্যর বার্টনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে ইবনে-আহমদ কম্পাস যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে আফ্রিকায় প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তাঁরই মারফতে ইউরোপ এই অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রের পরিচয় লাভ করে।

স্থলপথে "মরুভূমির জাহাজ" বা উটই ছিলো তেজারতীর প্রধান বাহন। মরুবাসী যাযাবর জাতির উটই ছিলো একমাত্র ধন-সম্পদ ও কেনা-বেচার উপকরণ। ইসলামের পূর্বে কারওয়ান্ (Caravan) এশিয়া ও আফ্রিকাময় বিস্তৃত থাকলেও আসলে কারওয়ান্ শব্দটি মুসলমানদেরই তেজারতীর বিস্তৃতি প্রমাণ করে। তাদের গৌরবময় যুগে কারওয়ান্দলই মুসলমান অধ্যুষিত ও শাসিত দেশগুলিতে পণ্যদ্রব্য ও হাজীর দল বহন করতো। তাদের গতিবিধি ছিলো ভারতে, চীনে, আফ্রিকায় এমন কি সুদূর মধ্য-রাশিয়া পর্যন্ত। এই তেজারতীর বদওলতে ইসলামিস্তানে যেমন অজস্র টাকাকড়ি আমদানী হতো, সেই রকম ভারত থেকে রাশিয়া, ফিন্ল্যাণ্ড, এমনকি আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত মুসলিমদের তাহজিব ও তমদ্দুন শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রত্যেক জাতিরই অনুকরণীয় ছিলো।

তবে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে খ্রিস্টজগত ইসলামিস্তানের সংস্পর্শে এসে তেজারত বা ভূতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান এক বছরে বা এক শতকের ভিতরে অর্জন করেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উভয়-জগতের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টজগত সে-আমলের নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমানদের কাছ থেকে এ-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলো। তবে দশ-শতকেই মুসলমানরা খ্রিস্টজগতের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং সে-আমলের অজ্ঞ, আধা-জড় খ্রিস্টান-সমাজকে নতুন প্রাণরসে চঞ্চল ও সঞ্জীবিত করে তোলে। তার দরুন ইউরোপে যে নতুন সাড়া জাগে, যে নতুন জীবন প্রবাহিত হয় তারই অমৃতময় ফল স্বরূপ বর্তমান যুগে খ্রিস্টজগত দুনিয়ার সর্বত্র নিজেদের প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ ও সক্ষম হয়েছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভূত্যের ন্যায় তুচ্ছ ভেবে দুঃসাহসিকতা, অভিযান করবার দুর্বার ও অদম্য স্পৃহা এবং শোভাসম্পদময়ী ধরণীর প্রত্যেকটি নাড়ীতে হস্তক্ষেপ করে মানবের সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধির শত-সহস্র উপকরণ প্রতিনিয়ত আহরণ করবার কল্যাণকর প্রেরণা ও দৃষ্টান্ত মুসলমানরাই খ্রিস্টজগতের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছিলো।

সাহিত্য

ইউরোপীয় সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব আলোচনায় গোড়ায় বলে রাখা দরকার যে ইসলামের বিশিষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর প্রভাব মধ্যযুগের সাহিত্যে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। যতোটুকু সাহিত্যিক প্রভাব ইউরোপে হয়েছে তা আরবী ভাষারই ও বিভিন্ন সাহিত্য-রূপ, প্রসংগ, কাব্যানুভাব ও বিশিষ্ট গ্রন্থের। ফারসী থেকেও ইউরোপীয় সাহিত্য কিছু আহরণ করেনি তা নয়, কিন্তু তা হয়েছে বহু পরে। আরবীই হোক বা ফারসী যে সাহিত্যেরই প্রভাব হোক, তার অন্তর্নিহিত ইসলামের যে বিশিষ্ট ধর্মানুভাব ছিলো, সেটিকে বাদ দিয়েই ইউরোপ এ-প্রভাব স্বীকার করেছে। সুতরাং এ আলোচনায় ইসলাম অর্থে মুসলমান ব্যবহৃত আরবীই বোঝা উচিত এবং প্রভাব অর্থে একান্তভাবে সাহিত্যিক প্রভাব, ধর্মাদর্শের নয়।

ভাষাতত্ত্ব দিয়েই এ আলোচনা আরম্ভ করতে হয়, কারণ মধ্যযুগে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাষাতত্ত্ব গবেষণা ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে প্রধান বিষয় ছিলো। তার আরো কারণ এই যে এই বিজ্ঞানের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিই সাহিত্যের অন্যান্য উচ্চশিক্ষার ও গবেষণার প্রাথমিক সহায় হয়েছিলো। ইদানিং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী হলেও এ ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানের প্রথম বিকাশের পথে আরবী-বৈয়াকরণদের আলোচনা-পদ্ধতির সাহায্য অনেক পরিমাণে রয়েছে। মুসলিম-জগতের ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বানুশীলনের দৃষ্টান্তও খ্রিস্টজগতে ইহুদীদের মারফতেই ছড়িয়েছিলো, কারণ তাদের ব্যবহারিক ভাষার ও আলোচনা প্রবন্ধেও এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ স্বতঃই অলক্ষেই হয়েছিলো। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত রাব্বি ডেভিড কিম্‌হির ধর্মীয় আলোচনাগুলিতে, যাতে আরবী ব্যাকরণানুমোদিত ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। এই ইহুদি আনীত দৃষ্টান্ত আবার ওল্ড টেষ্টামেন্টের সরকারী সংস্করণেও আত্মসাৎ করা হয়েছে।

কোনো এক দেশের সাহিত্য অপর দেশের সাহিত্যে কতোখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং কোন্ কোন্ পথে এ প্রভাব প্রবেশাধিকার পেয়েছে তা নির্ণয় করা সহজ কথা নয়। বহুকাল ধরে মেলা-মেশা, ভাবের আদান-প্রদান, দু'টি পৃথক জাতির সাহিত্যের সংমিশ্রণে কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু এগুলিই একমাত্র সংযোগসূত্র নয়। আবার সেই দু'টি জাতির মধ্যে ঐতিহাসিক সংযোগ মিত্র বা শত্রুভাবাপন্ন হওয়ার দরকারও আসল কথা নয়—ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেই ধরা পড়ে যে সাহিত্যের গতি যুদ্ধক্ষেত্রের সীমান্তেই রূদ্ধ হয় না। ঐতিহাসিক সংযোগসূত্রের চেয়ে এক্ষেত্রে পরস্পর মেলামেশাই অধিক কার্যকরী—ব্যক্তিগত হোক, পণ্ডিতদের দ্বারাই হোক, একদিক থেকে হোক বা দু'দিক থেকেই হোক, মিলনের সূত্র ধরেই এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশে নিজের প্রভাব সহজে বিস্তার করে। তবে এই প্রভাব-বিস্তারের সবচেয়ে বড়ো নিয়ম হচ্ছে দেওয়া-নেওয়ার মনোবৃত্তি—যে নেবে তার আগ্রহ থাকা দরকার আর যে দেবে তারও দেবার মতো বৈশিষ্ট্য থাকা চাই।

রেনেসাঁর যুগ থেকে অন্তত ঊনিশ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্য-সাহিত্য গ্রীক ক্লাসিকিজমে ভরপুর; তার পূর্বে গীর্জা ও পাদরী প্রভাবিত ল্যাটিন-আশ্রয়ী সাহিত্যিক ধারায় অখ্রিস্টান ও প্রাক্-খ্রিস্টীয় উপাদান খুব সহজদৃষ্ট ছিলো না, ধর্ম-গুরুদের অনুমোদিতও ছিলো না। আপাতদৃষ্টিতে এ অবস্থায় আরবী কেন, পাশ্চাত্যের কোনো বিদেশী ও বিধর্মী সাহিত্যিক প্রভাবই কার্যকরী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু দু'টি কথা মনে রাখলে এর বিপরীত প্রমাণ পেয়ে আশ্চর্য হওয়া উচিত হবে না। মধ্যযুগের যে-সাহিত্য ল্যাটিনের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা ছিলো শ্রেণী নির্ভর, অর্থাৎ ধর্মাভিজাত পুষ্ট—বিশপদের সৃষ্ট সাহিত্য ও রীতি। জনমনে তার সম্ভ্রম ছিলো, কিন্তু আনন্দের খোরাক তাতে ছিলো না। সাধারণ শ্রেণীর রসপিপাসা নিবৃত্তির যে উপায় ও রীতি ছিলো তার লিখিত নজীর প্রায় লুপ্ত হয়েছে। কারণ দেশীয় ভাষার লোকগাথায় ও রোমান্টিক কাহিনীতেই তা রস পরিবেশন করতো মুখে মুখে। বারো শতক থেকে এই দেশীয় ভাষা—বিভিন্ন ভার্ণাকুলারের কিছু কিছু—খুব সামান্য হলেও এই গণ সাহিত্যের যে টুকরাগুলি ইদানীং আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাতে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই প্রমাণই পেয়েছেন যে পাদরী নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যের ট্রাডিশনে এ-গণসাহিত্য জন্মলাভ করেনি। এর পিছনে যে ট্রাডিশন ছিলো, যে দৃষ্টান্ত, আদর্শ ও মানসিকতা ছিলো, তার অনেকখানিই অখ্রিস্টান মুর ও সারাসেনদের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

গণমনের এই রুদ্ধ ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ভার্ণাকুলারে লোকগাথায় ও কাহিনীতে যে তৃপ্তি খুঁজছিলো তার চাহিদা বহু পরিমাণে বেড়ে গেলো রেণেসাঁর যুগে নতুন সমাজ-শ্রেণী সৃষ্টি হওয়াতে। যে-শ্রেণী পূর্বে ব্যারণদের কালচারের বাহির-মহলে

অনাহূতভাবে দাঁড়িয়ে সভয়ে এই ল্যাটিন সাহিত্যিক ধ্বজার দিকে তাকিয়ে থাকতো, সেই ব্যবসায়ী, শিল্পী, মজুর ও চাষী শ্রেণীর লোকেরা তাদের গ্রামীন বাড়ী ও মন দিয়ে শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে তুললো এবং মুদ্রন-যন্ত্রের প্রসারের ফলে ক্রমবর্ধমান পাঠকসমাজের জন্য যে ভার্ণাকুলার সাহিত্য পরিবেশন হতে লাগলো, তাতে তাদেরই রস পিপাসা নিবৃত্তির প্রকৃত উপাদান এসে গেল অলক্ষ্যেই। নবাবিষ্কৃত গ্রীক-সাহিত্যের প্রাধান্য অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা কিছুদিন জোর করেই অবশ্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো, কিন্তু এই যুগেও ইংরাজী নাটক, ব্রিটন রোমান্স, টিওটনিক লোকগাঁথা ইত্যাদির উদ্ভব ও জনপ্রিয়তা থেকে পূর্বতন্ গণ-রুচিরই অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের প্রমাণ মেলে। ক্লাসিক-প্রাধান্যের সমতা রক্ষার জন্য ভার্ণাকুলার সাহিত্য প্রতিযোগিতা করলেও জনগণ তাতে বেশীদিন তৃপ্তি পেলো না,—মধ্যযুগের মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে, অভিজাত ধর্মানুভাব-পীড়িত ল্যাটিন-সাহিত্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে যে বিচিত্র রোমান্স ও রঙীন কল্পনার আস্বাদন তারা পেয়েছিলো, তারই জন্য তাদের অন্তরমন রইল ক্ষুধিত। গ্রীক ও ল্যাটিনের স্বচ্ছতা ও সংযমের গুণে ক্লাসিক সাহিত্যে ইউরোপের নতুন পাঠক সমাজ রসজ্ঞ পণ্ডিত-জনোচিত তৃপ্তিলাভ করলো, ক্লাসিকের অনুকরণে রচিত ভার্ণাকুলার সাহিত্য ও ভাবধারার আস্বাদ পেলো এবং কেবল বুদ্ধি দ্বারাই যে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নিরূপন করা হয় তার রসিক করে তুললো; কিন্তু আরবী ও ফারসীতে যে রোমান্স, যে রঙ, যে আন্তরিকতা-ব্যাকুলতা ও কল্পনা-উদ্দীপনা এবং হৃদয়াবেগ ও অনুভূতিকে সঞ্জীবিত করে তোলে তা ক্লাসিক সাহিত্যে কোথায়? ষোলো ও সতেরো শতকে পশ্চিম ইউরোপের ভার্ণাকুলার সাহিত্যগুলি সেই হারাণো সুরেরই সন্ধান করেছে এবং আঠারো শতকে তাকে ফিরে পেলো আরব্য উপন্যাসে। এবং একে উপলক্ষ করে আরবী ফারসী সাহিত্যের ভাবধারায় ইউরোপের অভিজাত সাহিত্যে প্রবেশ করতেই দেখা গেলো যে ইউরোপীয় জনগণ আকুল আগ্রহে আকণ্ঠ ভরে আরবী ফারসী সাহিত্যের রসপান করতে শুরু করেছে, ক্লাসিক সাহিত্যের কৌলিন্য আর বজায় রইলো না। অধ্যাপক ম্যাক্ইল Mackail এর কথায় ইউরোপ জুডিয়া থেকে যেমন ধর্মজ্ঞান শিক্ষা করেছিলো, সেই রকম আরব থেকে রোমান্স শিক্ষা লাভ করেছিলো।

ইউরোপ কোন্যুগে কতোখানি মুসলমানদের সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলো আজ তা নিরূপন করা শক্ত, তবে একথা অনস্বীকার্য যে ইউরোপ প্রাচ্যের আরবী ও ফারসী থেকে অনেক কিছু আহরণ করেছে অসংকোচে। এই সিদ্ধান্তের বিস্তারিত প্রমাণ মেলে ইউরোপের কথা, কাব্য এমনকি দর্শন সাহিত্যেও। মুখে মুখে আরবীর গল্প-কাহিনী ও রচনা-ভংগি পশ্চিম ইউরোপের লোকসাহিত্যে বহু পূর্বেই ছড়িয়ে পড়েছিলো। তেরো শতকে প্রচলিত উপকথা

জাতীয় গল্প গুলিতে আরবীর সাক্ষাৎ প্রভাব ইদানীং অস্বীকৃত হলেও লোক সাহিত্যের বহুলাংশে প্রাচ্য তথা আরবী ইতিহাস ও ঘটনাবলীর স্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। জার্মান্ Rolandslhedi, Isolde Blanchemain-এর কাহিনী এবং উত্তর ইউরোপে প্রচলিত অন্যান্য কাহিনীর মধ্যে আরবী রোমান্সের প্রভাব আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। Grail saga-র একটি সংস্করণের সংকলয়িতা নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন যে একখানা আরবী গ্রন্থ থেকে তাঁর লেখার বিষয়-বস্তু গ্রহণ করা হয়েছিলো। অতি পুরাতন উপন্যাস Floire et Blanchefleur এবং এরই উপসংহার হিসাবে Aucassin et Nicoletteতে আরবী উপকথার প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। দ্বিতীয়টির নায়কের নাম-ধর্মের (Cassim) আরব হওয়ায় কোনো সন্দেহেরই অবকাশ নেই। Chante Fable (জনগণ সমক্ষে অভিনয়ের সংগে আবৃত্ত নীতিকথা) এর মনোহারিত্ব ও হৃদয় গ্রাহিতা ইউরোপীয় সাহিত্যে অতুলনীয়, কিন্তু তা আরবীতে বহু প্রচলিত গল্প বর্ণনাভংগীর অনুকরণ মাত্র।

স্পেনের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ও লোকগাঁথায় যে বর্ণচ্ছটা, ভাবাবেগ ও গতিচ্ছন্দের ঐশ্বর্য দেখা যায়, তা যে আন্দালুসের মুসলিম কালচারেরই ছায়াপাত সে-বিষয়ে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না, কারণ গ্রানাডা বিজয়ের পরেই স্পেনে যে সাহিত্যিক-রুচির দেখা মেলে, তার সংগে উত্তরাগত খ্রিস্টানদের ধর্মানুভাব ও মানসিকতার সাদৃশ্য অল্পই দেখা যায়। স্পেনীয় সাহিত্যে 'মরিস্কো রোমান্সের' (মুসলমান বিতাড়নের পরেও যে সব মুসলমান প্রাণভয়ে তাদের ধর্মকে গোপন করতো তাদেরকেই মরিস্কো বলা হয়) প্রভাবও কিছু কম নয়। এই সময়ে Amadis de Gaula, Historia del Abencerrage, Guerras Giviles প্রভৃতি কাহিনীগুলির সৌন্দর্য ও অনুভাব এই আরবী-আন্দালুসীয় সংস্কৃতিরই প্রতিধ্বনি। এই মরিস্কো রোমান্সগুলিতে যেমন স্পেনীয় ও মুরীয় সভ্যতার সমন্বয় দেখা যায়, তেমনি এগুলির প্রভাবে ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের নতুন দিক খুলে যায়, দৃষ্টিভংগী পরিবর্তিত হয় এবং—অধ্যাপক গীবের কথায়—আধুনিক কথা ও উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম হয়। বিশ্ব-সাহিত্যের সম্মানিত ও বহু পরিচিত গ্রন্থ Cervantes এর Don Quixote আরবী-আন্দালুসীয় অনুভাব ও চাতুর্যের প্রতিফলন। প্রেস্‌কট সাহেবের মতে এখানি পুরো মাত্রায়ই আরবী কালচার ও চিন্তাভংগী থেকে উদ্ভুত। স্পেনীয় সাহিত্যের অন্য বহু প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্বন্ধেও উপরোক্ত মন্তব্য খাটে।

এগারো শতকের গোড়া থেকেই দক্ষিণ ফরাসীতে এক নতুন ধরনের কাব্য অনুভাবে, প্রেরণায়, আলাপে-সংলাপে, টেকনিকে ও সমাজ-মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কাব্যের পরিভাষায় ট্রাবাডুর (Troubadour)

কবিতা নামে এসব কবিতা খ্যাতিলাভ করেছে। ফ্রান্সের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য থেকে এমন কিছুই মেলে না যা-থেকে এসব কবিতার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু সূত্র পাওয়া যায়, অন্যপক্ষে সমসাময়িক স্পেনীয় কবিতার সংগে টেকনিকের দিক দিয়ে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। এ-থেকে একথা সহজেই বলা চলে যে প্রথম যুগের দক্ষিণ ফরাসীর (Provencal) কবি-গোষ্ঠি আরবী মডেল ও টেকনিকের দ্বারাই প্রধানত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। আঠার শতকে সিসমণ্ডি (Sismondi) ও ফরেল (Fauriel) পর্যন্ত অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন যে প্রভেন্সাল কবিতার সংগে আরবী কবিতার অতি নিকট সম্বন্ধ রয়েছে।

রচনার বিষয়-বস্তুই প্রভেন্স্যাল কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিলো না, একটি বিশিষ্ট ভংগীতে প্রসংগটির অপরূপ বর্ণনাই এসব কবিতার বিশেষত্ব গ্রাম্য-গাঁথায় যে প্রেম সহজ ও আবেগময়ী ভাষায় প্রকাশ পেতো, সেই প্রেম ভাষার চাতুর্যে ও কল্পনার অতি সূক্ষ্ম বুননে মোহনীয় রূপ ধারণ করতো। প্রভেন্স্যাল-কাব্যে রূপায়িত প্রেম কল্পনার রঙে রঙীন, হৃদয়াবেগ এখানে ধর্ম রূপান্তরিত এক পদ্ধতি বিশেষ (Gult), এ প্রেমের শারীর-অবস্থা রোগের সম-পর্যায়ভুক্ত—যার আদর্শ পরকীয়া কুমারী নয়, প্রেমময়ী প্রীতিময়ী পত্নী। আপন কুটির-রাণীর প্রেমে ও পূজায় অভিষিক্ত কবির জীবন যে অপরূপ ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠতো, তাই অপরূপ ভাষায়, ব্যঞ্জনায় ও রঙে প্রকাশ পেতো। প্রেমের এই আর্ট, এই পত্নী-প্রেম কোথা থেকে জন্ম নিলো? সে আমলের টিউটনিক কাব্যে এ প্রেমের স্থান ছিলো না। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে নাইট-হুড ও শিভ্যলরীর যে আদর্শ দেখা যেতো তার ভিতরেও পত্নী-প্রেমের নাম-গন্ধ ছিলো না। খ্রিস্টীয় মঠের কৌমার্থ আদর্শের মধ্যেও এ প্রেমের স্থান নেই। অথচ প্রেমের এই রূপের, এই আদর্শের পিছনে একটা সাহিত্যিক ট্রাডিশন ছিলো। এর মূল সূত্র খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে আরবী-স্পেনীয় কবিতাই এসব প্রভেন্স্যাল কবিতার খাঁটি উৎস ছিলো।

এগারো শতকের মধ্যে স্পেনের আরবী কাব্য আশ্চর্য উন্নতি লাভ করে। কবিতার ধারাও পরিবর্তিত হয়—পুরাতন গাঁথার স্থলে গীতি কবিতা Lyrics অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দরবারী কবিরা লিরীক কবিতায় ছন্দের মাধুর্য ফুটিয়ে ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা করতে থাকেন; জনসাধারণের অন্তরে চির-চাওয়া ও চির-না-পাওয়া আদর্শ প্রেমিকার জন্য স্বার্থলেশ-শূন্য সুগভীর প্রেম লিরীক কবিতায় উৎসারিত হতে থাকে আর মিষ্টিক কবিদের হৃদয় মন অতীন্দ্রিয় লোকের অনাবিল প্রেমের স্পর্শে আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠে লিরীক কবিতায় প্রকাশ লাভ করতে থাকে। ইবনে দাউদের বিখ্যাত গ্রন্থে এই প্রেমের বিচিত্র রূপ, প্রকাশভংগি, প্রকৃতি ও পদ্ধতি কাব্যিক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো হয়েছে। তাতে ইসলামী ট্রাডিশন পুরো মাত্রায় বজায় রেখে বিশ্বনবীর এই কথারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে যে ভালবাসে,

কিন্তু ভালোবাসাকে অন্তরে পুষে রেখেই সৎজীবন যাপন করে মৃত্যু আলিংগন করে সে একজন প্রকৃত শহীদ। ইবনে হাজমের মতো একজন গোঁড়া ধার্মিক ও তুলনামুলক ধর্মবিজ্ঞানের জন্মদাতা কবিও তাঁর 'ত্বক্ অল্ হামামা' নামক গ্রন্থে এরকম নিষ্কাম ও স্বর্গীয় প্রেমের মহিমা গেয়েছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রমাণ পেয়েছেন যে আন্দালুসে এগারো শতকে আরবী লিরীক কবিতার যে উৎকর্ষ হয় তার টেকনিক, ছন্দ ও মিলের অনুশাসন এবং কল্পনার রচনার ও ধারার সংগে এই প্রেমের ও আদর্শের ও ট্র্যাবাডুর কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। আরবী এই আদর্শ প্রভেন্স্যাল ভাষায় গৃহীত হওয়ার যে মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন তার অভাব পূরণ করেছিলো স্পেনের দোভাষী লিরীক্ জজল্। আরবী ও স্পানিশ ভাষী স্পেনীয় খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যেই এর জন্ম এবং দোভাষী খ্রিস্টানরাই এই মিশ্র ভাষার ও আরবী আদর্শ উত্তরে প্রচার করেছিলো, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফ্রান্সের গ্রাম্য গাঁথা দোভাষী Villancico-র সংগে এই জজলের ঐক্য। এই তিনটি ধারা আরবী লিরীক কবিতায় যে রূপ লাভ করেছিলো, তার প্রভাব ইউরোপীয় সাহিত্যে বিশেষ ভাবে প্রতিভাত।

অ্যাডভেঞ্চার বা দুঃসাহসিক অভিযান এবং ভৌগলিক সাহিত্যে আরবীর প্রভাব সবচেয়ে বেশী। উপরে জনমনের যে রোমান্স পিপাসার কথা বলা হলো, তা সব চেয়ে বেশী তৃপ্তি পায় এই সব দুঃসাহসিক অভিযান ও রহস্যময় দেশসমূহের গল্পে ও বর্ণনায়। সে আমলে খ্রিস্টানেরা প্রধানত পবিত্র ভুমি জেরুজালেমেই সফর করতো, তার দরুন তীর্থ যাত্রীদের মারফতেই ভ্রমণ কাহিনী ও পৃথিবীর নানা দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও আচার ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান ইউরোপ লাভ করতো। বাহির বিশ্বের চাবি তখন ছিলো আরব তথা মুসলমানদের হাতে এবং তাদের মুখেই ইউরোপ রহস্যময় বিশ্বের বিন্যাস রীতি ও নাম-না জানা জাতির কাহিনী শ্রবণ করতো। খ্রিস্টান তীর্থ যাত্রীরা জেরুজালেম, প্যালেষ্টাইনে এসে যতটুকু দেখলো ও শুনলো তা মুসলমানদের রচিত কাহিনীর সংগে মিশিয়ে নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও কথিকায় রূপান্তরিত হয়ে প্রচারিত হতো। মার্কো পলো ও স্যর জন ম্যাণ্ডেভীলের ভ্রমণস্পৃহা এসব কাহিনী থেকেই জাগে। সুদূর আয়ারল্যাণ্ড ও স্কাণ্ডিনেভিয়াতেও এসব গল্প ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ছড়িয়ে পড়ার দরুন I egend of St. Brendan প্রভৃতি মঠ-বাসিদের অদ্ভুত কাহিনীও রচিত হতে থাকে। Boccacio তাঁর Decameroneএ লেখা ভ্রমণ কাহিনী গুলি এরকম মুখে মুখে শোনা গল্প থেকেই রচনা করেছিলেন। Chaucer এর Squires Tales আরব্য উপন্যাসের একটা গল্পের ছায়া মাত্র। আরবী সিন্ধবাদের কাহিনী (আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদ নয়) সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নেওয়া বলে অনেকের ধারণা হলেও এ বিষয়ে সকলেই একমত যে এই কাহিনীটি আরবদের

নিকট থেকেই নিয়ে গ্রীক, হিব্রু, স্পানিশ, ল্যাটিন ও ইংরাজী সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে।

স্পেনের মধ্যবর্তিতায় আরবীয় আর একটা সাহিত্য ভংগি ইউরোপে প্রবেশ লাভ করে, তা হচ্ছে আরবীর সব চেয়ে আয়াসসাধ্য ও কৌশলনিপুণ মোকামাত, যা একরকম অননুকরণীয়। মিলযুক্ত পদ্যে এবং নানা ভাষার চাতুরীতে পূর্ণ এই মোকামাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোট ছোট ঘটনার বিবরণ আর ভবঘুরে ও কপর্দকহীন কিন্তু বিবেক বিবর্জিত নায়ক অপূর্ব বাগ্মিতায়, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের বলে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে লোক ঠকায় এবং অন্নসংস্থান করে। স্পেনের এক ধরনের উপন্যাসে এই মোকামাত গল্পের অনুকরণ চেষ্টা দেখা যায়, তার পথপ্রদর্শক ছিলো ইহুদী সাহিত্যিকরা। El Cavallero Cifan এ এই ধরনের বাকচতুর ও প্রবঞ্চক নায়কের দেখা পাওয়া যায় এবং ইতালির কয়েকটি বাস্তব উপন্যাসেও এই রকম ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

মুসলমান বাহিত এই সব রোমান্স ও কাহিনীর আনুসংগিক আবহাওয়ার সংগে প্রাচ্যের নীতিকথা, গদ্য-কাহিনী, প্রবাদ ও দর্শনের টুকরাও এই সময়ে ইউরোপে আদৃত হতে থাকে। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের আরবী অনুবাদ কালিলা-ওয়া-দিমনা নামে আটশতকেই মুসলিম জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর প্রথম অনুবাদ তের শতক থেকে আরম্ভ করে আঠারো শতক পর্যন্ত (অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত) ইউরোপীয় নানা ভাষায় ও নানা পোষাকে এবং একাধিক সংস্করণে এই গল্পগুলির পরিবেশন হতে থাকে। এই রকম মিসরীয় মুবাশশীর ইবনে কাতিক সংকলিত প্রাচীন নীতিকথাও স্পানিশ ও ল্যাটিনের মারফত ফরাসী, জার্মানী ও ইংরাজীতে ভিন্ন নামে গৃহীত হয়। The Dictes and Sayings of Philosophers (দার্শনিকের নীতি ও সদুপদেশ) একখানা আরবী গ্রন্থের ল্যাটিন তর্জমার ফরাসী অনুবাদ থেকে নেওয়া Caxton কর্তৃক মুদ্রিত প্রথম পুস্তক। Don John Manuel কর্তৃক রচিত এই জাতীয় গ্রন্থ El Conde Lucanor এর অনুপ্রেরণাই শুধু আরবী থেকে আসেনি, তার উপক্রমণিকাও আরবী ভুমিকা পদ্ধতির নিখুঁত অনুকরণ।

রেনেসাঁর যুগে (চৌদ্দ থেকে ষোল শতক) শত নিষেধের বেড়া সত্ত্বেও শিল্পীমন এই অনুকরণ প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে পারেনি। দান্তের Divina Commedia তে হজরত মোহাম্মদের মে'রাজ শরীফ (সশরীরে স্বর্গারোহণ) ও তার সংশ্লিষ্ট স্বর্গ নরকের বর্ণনা বহুল পরিমাণে ঢুকে গেছে। সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে যে মে'রাজ শরীফের আরবী উপাখ্যানে প্রচলিত কাহিনীগুলিই দান্তের ডিভাইনিয়া কমেডিয়ার কল্পনার প্রধান উৎস। দান্তের আরবী না জানাতেই এ সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় না, কারণ তাঁর সময়েও দক্ষিণ ইতালীতে আরবী অধ্যয়ন যথেষ্ট পরিমাণে চলতো

এবং সিসিলিতে নরম্যান ও হোহেন্সট্যুফেন্দের সময় থেকেই সেখানকার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক রূপ আরবী-ঘেঁষা হয়ে গিয়েছিলো। তা ছাড়া ইসলামের এই সর্বজনবিদিত ঘটনাটির ও আনুসংগিক বর্ণনার অতিরঞ্জন ইতালী তথা খ্রিস্টান জগতে অন্যান্য মুসলমানী উপাদানের সংগে একরকম সাধারণ হয়ে গিয়েছিলো। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে St. Patrick's Purgatory উপাখ্যানে মুসলমান দার্শনিক চিন্তার ছায়া, সুফিদের চিত্রকল্প ও ইন্দ্রিয়সুলভ কল্পিত রসানুভূতির প্রভাব শুধু দান্তের কাব্যেই নয়, সে সময়কার অন্যান্য কবিদের চিন্তাধারাতেও মেলে। দান্তের কাব্যে ইবন্ অল্ আরাবী, আবু রুশদ্ (Averros) ইবনে-সিনা (Avicenna) আল-গাজ্জালী (Algazel) প্রভৃতি মুসলিম শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ ছাপ সহজেই পাঠকের নজরে পড়ে। চসারের (১৩৩৯-১৪০০ খ্রি.) Haus of Fame কবিতায় দান্তের মারফতে ইসলামী প্রভাব যথেষ্ট—একটা বৃহদাকার ঈগল পাখীর পিঠে চড়ে উর্ধ্বাকাশে Haus of Fame এ উপস্থিত হওয়ার কাহিনীতে হজরত মোহাম্মদ কর্তৃক তাজী বোররাকে (স্বর্গীয় বাহন) সওয়ার হয়ে উর্ধ্বাকাশ ভেদ করে আরশ কুর্শিতে উপস্থিত হওয়ার গল্পের সংগে মোটেই পার্থক্য নেই। অবশ্য চসার প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো মুসলমান সাহিত্যিক থেকে কিছু ধার করেছেন কিনা বলা যায় না। চসারের Canterbury Tales কাব্যে ক্রুসেডের বর্ণনায় ইসলামী আবহাওয়া এড়ানো একান্ত অসম্ভব ছিলো।

১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে গ্যাল্যাণ্ড সাহেবের অনুদিত আলিফ-লায়লা-ও-লায়লা (সহস্র এক রজনী আরব্য উপন্যাস) ইউরোপে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার ফল হলো অপূর্ব ও কল্পনাতীত। আলিফ-লায়লা একদিনেই ইউরোপের চিত্তজয় করে ফেললো, পাঠক গোষ্ঠীর মন কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে উঠলো। প্রকাশকের দল সময়ের চাহিদা মেটাতে পরস্পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ করলো, হাজারে হাজারে নতুন ও অভিনব সংস্করণে আলিফ-লায়লা জন্ম নিতে লাগলো। এক আঠারো শতকের মধ্যেই গ্রন্থখানি ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অন্তত পক্ষে ত্রিশবার ছাপানো হয়েছিলো। তারপর ইউরোপের সবরকম ভাষায় তিনশো সংস্করণের বেশী মুদ্রিত হয়েছে। আর সংগে সংগে প্রকাশিত হতে লাগলো পারস্য উপন্যাস, তুরস্ক উপন্যাস। লেখক গোষ্ঠিও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। যুগের চাহিদা অনুযায়ী তাঁরাও সাহিত্য সৃষ্টি করতে লাগলেন, আলিফ-লায়লার কাঠামো ও ভংগিতে গল্প ও কাহিনী লিখতে লাগলেন। আলিফ-লায়লার মধ্যে এ্যাডভেঞ্চারের যেসব আশ্চর্য ও অপূর্ব কাহিনী আছে, তারই ভংগিমায় ইউরোপের কথা সাহিত্য নবরূপ পরিগ্রহণ করলো, রবিন্সন ক্রুসো, গালিভারের ভ্রমণ কাহিনীর মতো দুঃসাহসিকতাজাতীয় ও বৈচিত্রময় ভ্রমণ কাহিনী সৃষ্ট হতে লাগলো। অধ্যাপক গীব সাহেবের মতে একথা বলা মোটেই বাড়াবাড়ি হবে না যে আলিফ-

লায়লা ইউরোপে আত্মপ্রকাশ না করলে Robinson Crusoe এবং সম্ভবত Gulliver's Travels এর জন্ম হতো না।

আরব্য উপন্যাসের ভিতর দিয়ে যে জগত ও অনুভাবের পরিচয় ইউরোপ লাভ করলো, তারই ফলে জার্মান সাহিত্যে নতুন দৃষ্টিভংগি প্রবর্তিত হলো। ফারসির সংগে এ-পর্যন্ত সাক্ষাৎ পরিচয় ইউরোপের জন্মেনি, কিন্তু সতেরো শতকের গোড়ায় Olearius কৃত শেখ সাদীর গুলিস্তান্ ও বুস্তানের জার্মান অনুবাদ কল্পনার রঙের ও চিন্তা ধারার আর একটা উৎস খুলে দিলো। ফারসী সাহিত্যের অনাস্বাদিতপূর্ব ঐশ্বর্যে জার্মানী মোহাবিষ্ট হলো এবং প্রাক্তন আরবী থেকে আহৃত সাহিত্যিক উপাদানের সংগে মিলে যেমন একদিকে আঠার ও ঊনিশ শতকে রোমান্টিক নব জাগরণের (Revivalism) সূচনা করলো, তেমনি রহস্যময় ও জাঁকজমকে ভরা রঙীন প্রাচ্যের আবহাওয়া সৃষ্টিও সাহিত্যের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ালো। এই শেষোক্ত ফারসীয়ানার উদাহরণ পাওয়া যায় ইংরাজীতে Southey-র Thalaba, More-এর Lalla Rukh, Suhrab-Rustom, ফরাসীতে Oehlenshlager এর Alladin, Victor Hngo-এর Les Orientales প্রভৃতিতে—যাতে ঐশ্বর্যময়, জাঁকজমকের আলো ঝলো-মলো রূপেই প্রাচ্যকে কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এসবের ভিতরে ইসলাম বা অন্য প্রাচ্য-সভ্যতার অন্তর্নিহিত আদর্শের দেখা মেলে না। মুসলমান ও তাদের সাহিত্য-দর্শনের এই দিকটার দিকে ইউরোপের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো স্যর উইলিয়ম জোন্স-এর সম্পাদিত ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত Commentaries on Asiatic Poetry প্রকাশের পর থেকেই ও তাঁর প্রবর্তিত প্রাচ্যের কৃষ্টি ও সভ্যতা অনুসন্ধানের স্পৃহা থেকে। এই দৃষ্টান্ত জার্মানীতে ফারসী কাব্যের রসাস্বাদিত সাহিত্যিকদের মনে নতুন যে আদর্শ স্থাপন করলো তা পাশ্চাত্যের গুলিস্তান্ গ্যেটের দিওয়ানে (Westostliche Divan) অপূর্ব ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছিলো। গ্যেটে প্রাচ্যের কাব্যধারায় এমন একটা স্বর্গীয় রূপ দেখেছিলেন, যার কল্পনায় তিনি দৈনন্দিন সংসারের যাবতীয় হীনতা দীনতা ও পাশবিকতা থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারতেন। নিছক অনুকরণ প্রবৃত্তিতে তাঁর মতো একটা বিরাট প্রতিভা তৃপ্ত হয়নি, ফারসী কবিতার আর্ট ও আদর্শের সংগে মধ্যযুগের রোমান্টিক ভাবধারাপুষ্ট ইউরোপীয় ট্রাডিশনকে তিনি সমসূত্রে বেঁধে নিজেকে প্রকাশ করবার একটা অপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছিলেন—তার দরুন তাঁর দিওয়ান জার্মান সাহিত্যে তাঁকে অমর করে রেখেছে। হেনরিক হায়েনের কবিতাতেও প্রাচ্যের লিরিক সুরের প্রাচুর্য সহজেই ধরা পড়ে।

ইংরাজী ও ফারাসীতে মুসলমান সাহিত্যের সত্যিকার সমঝদারী ও রস গ্রহণের পরিচয় জার্মানির মতো কিন্তু হয়নি—মুসলমানী নাম ও আবহাওয়ার অনুকরণে যা সৃষ্ট হয়েছে তাঁর অধিকাংশই ভিক্তর হুগো বা বায়রণের সৃষ্ট কাব্য

উপন্যাসের মতো প্রাচ্যের রঙ মাত্র, প্রাচ্য সাহিত্যের আদর্শ তাতে নেই। এই ধরনের গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য লিখিত হয়েছে বহু, কিন্তু এক সমালোচকের মতে এসবকে যদি ইসলামের প্রভাবের ফল হিসাবে ধরা যায়, তাহলে ইসলামের কলংকেরই কথা বলতে হবে, কারণ তাতে সাহিত্যও নেই, রসও নেই—আছে উদ্ভট কল্পনা-বিলাস ও খাপছাড়া অনুকরণ। উনিশ শতকে গ্যেটের আদর্শে মুসলিম প্রভাবিত সাহিত্যের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র অবদান হচ্ছে ইংরাজীতে ফিট্জিরাল্ডের (Fitzgerald) ওমার খইয়াম—এটা ঠিক তর্জমা নয়; ইংরাজীর মধ্যে ফারসী কাব্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমসৃষ্টি। উনিশ শতকের দ্রুতগামী ইউরোপীয় কালচারে এগারো বারো শতকের ইস্পাহানী কবির অনুভাব নিখুঁত ভাবে সংযোজিত হয়েছে।

ইউরোপীয় সাহিত্য ক্ষেত্রের দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে মুসলিম-প্রাচ্যের সাহিত্য-প্রভাব অকিঞ্চিৎকর ও বিফল বলেই মনে হবে। কিন্তু যখন দেখা যায় যে প্রাচ্যের ভাবধারা পাশ্চাত্যের সাহিত্য সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়নের উপকরণ হিসাবে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তখন প্রাচ্যের গুরুত্ব স্বীকার না করে উপায় থাকে না। আমাদের অনুমান যদি সঠিক হয় তাহলে একথা বলা চলে যে তিনটি বিভিন্ন যুগে প্রাচ্যের মুসলিম সাহিত্য পাশ্চাত্যের সাহিত্যে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করেছে। তবে এই প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক যুগে সমপরিমাণের না হলেও সমজাতীয় ফলদায়ক হয়েছিলো। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর কাজ ছিলো গোঁড়া ও অসহনীয় নিয়মানুবর্তিতার বেড়া ভেঙে দিয়ে কল্পনার গতিকে মুক্ত করে দেওয়া এবং প্রচলিত রীতিকে অস্বীকার করা। যে কল্পনা ও সৃষ্টি-শক্তি এতোকাল মুর্ছিত ও নিষ্ক্রিয় ছিলো তাকে সজীব ও প্রাণবন্ত করার জন্যই মুসলিম-সাহিত্য পাশ্চাত্য-জগতকে অপরিশোধ্য ঋণভরে আবদ্ধ করে রেখেছে। যে জাগরণ ও উত্তেজনা আমদানী হলো তা নিজস্ব মাল-মশলার মধ্যেই উপাদান সংগ্রহ করতে লাগলো এবং প্রাচ্যের উপাদানগুলি দেশীয় উপাদানের সংগে এরকম অবিচ্ছিন্নভাবে মিলে-মিশে যেয়ে নতুন রূপে বিকশিত হয়ে উঠলো যে কোনটি আমদানী ও কোনটি দেশজ তা নির্ণয় করার উপায় রইলো না। তবে একথা বলা যায় যে ইউরোপীয় সাহিত্যে মডেল দান করার কাজে প্রাচ্য একরকম অপ্রধান অংশই গ্রহণ করেছে। মধ্যযুগে যখন ইসলামী সভ্যতা ও খ্রিস্টজগতের মধ্যে মানসিক ধারায় যথেষ্ট মিল ছিলো, তখন পাশ্চাত্য-জগতের অনুকরণবৃত্তি বেশ ফলপ্রসু হয়েছিলো; কিন্তু রেনেসাঁর পরে এর দ্বারা কেবলমাত্র নির্দোষ কৌতূহলেই জাগতো। ঠিক একই কারণে প্রাচ্যের সাহিত্যের সংগে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় চিন্তার সংস্পর্শ যেরকম অপরিমেয়ভাবে ফলপ্রসু হয়েছিলো তা আর পরবর্তীকালে সম্ভব হয় নি।

মধ্যযুগের ইসলামী ও খ্রিস্টানী সাংস্কৃতিক ভাবধারায় এমন একটা ঐকতান ছিলো, যার দরুন খ্রিস্টজগত আরবী সাহিত্য ও কাব্য ক্ষেত্রে অমৃতময় ফলই চয়ন করেছিলো। রেনেসাঁর যুগে এই ঐকতানটি কেটে যায়, তার দরুন সে আমলের আহরণ অনেকক্ষেত্রে অনাবশ্যক এমন কি তিক্ত ও বিরক্তিকর আবহাওয়াই সৃষ্টি করেছিলো। এবং তার ফলেই ইসলামের প্রতি তখনকার যুগে এতো বিদ্বেষ-বিষ জমে উঠেছিলো। বর্তমানে দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন হয়েছে, আজ ইউরোপ নিজের গরজের তাগিদে প্রাচ্যের সাহিত্য ও কাব্যক্ষেত্রে বিচরণ করছে, এজন্য তাদের স্বাভাবিক নীচতা ক্ষুদ্রতা দূর হয়ে গেছে, প্রাচ্যের সাহিত্য ভাণ্ডারে যা কিছু অমৃতময়, মংগল ও কল্যানকর তাই তারা দু'হাতে উজাড় করে আহরণ করে চলেছে। এর ফলাফল শুভ, সন্দেহ নাই।

দর্শন ধর্ম ও সুফিবাদ

মধ্যযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের যোগসূত্র কি কি ছিলো, মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান কতোখানি প্রসারিত ছিলো এবং বিশেষ ভাবে ইসলামী দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব খ্রিস্টজগতে কতোটুকু প্রভাব বিস্তার করেছিলো, সে-বিষয়ে মতদ্বৈধতা বড্ড বেশী। এসব নিরূপণের আসল তথ্য সংগ্রহ করা বড়ো কঠিন ব্যাপার এবং মতামতের গরমিল এতো দুস্তর যে কোনো সামঞ্জস্য করাও সহজসাধ্য নয়। মুসলিম লেখকরা দাবী করেন যে ইউরোপীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব মুসলিম দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের কাঠামোর উপরেই প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়েছে, ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মুসলিমদের শিক্ষাকেন্দ্রের অনুসারী হয়েই গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা জোর গলায় প্রতিবাদ করেন যে আরবী বা ইসলামী নাম দেওয়া যেতে পারে এমন কোনো দর্শনশাস্ত্রের অস্তিত্বই নেই—মুসলমানরা গ্রীক-দর্শন নিয়েই রোমন্থন করেছে, তারপর ভারত ও ইরাণ থেকে আরো কিছু উপাদান আহরণ করে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রটাই ঘোলাটে ও মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

এই বিপরীত মতামতের মাঝেই আমাদিগকে আসল সত্য আবিষ্কার করতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে মুসলিম মননশক্তির বিকাশের মূলে রয়েছে গ্রীকদের প্রভাব—মুসলিম চিন্তানায়করাও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। বসরার অল-জাহিজ (মৃত্যু ৮৬৯ খ্রি.) একজন নামকরা চিন্তানায়ক ও লেখক ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, “আমরা কি প্রাচীন জাতিসমূহের অমূল্য জ্ঞানসম্পদ লাভ করিনি এবং সে সবের দ্বারা আমাদের দৃষ্টিশক্তি কি প্রসারিত হয়নি? আমাদের যদি এই জ্ঞানের সংগে পরিচয় না হতো তাহলে আমাদের চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান অনেকখানি অসম্পূর্ণ থেকে যেতো এবং আমাদের বিচার ও দৃষ্টিশক্তিও অকেজো হয়ে

থাকতো।” মুসলমানরা পিথাগোরাস, এম্‌পিডোকল্‌স্‌ প্লেটো, এরিষ্টটল্‌ এবং পরবর্তী আমলের নিও-প্লেটোনিজদের চিন্তাসৃষ্টি ও রচনা থেকে অনেক কিছুই লাভ করেছে। খ্রিস্টীয় ধর্মযাজক প্রভাবিত মধ্যযুগে প্রাক্‌-খ্রিস্টীয় কোনো সাহিত্য, দর্শন বা আর্টের আলোচনা নিয়মবিরুদ্ধ ছিলো। তার দরুণ গ্রীকদের আশ্চর্য জ্ঞান ভাণ্ডার, ও ক্লাসিক-ট্রাডিশন সারা ইউরোপখণ্ডে অজ্ঞাত ও অপরিচিতই ছিলো। এগারো শতক পর্যন্ত ইউরোপের চিন্তাধারায় যে দর্শন প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলো, তার কেন্দ্রে ছিলো পোপ-শাসিত রোমান চার্চের একাধিপত্য সপ্রমাণ ও রক্ষা করা। কনষ্টান্টিনোপলে খ্রিস্টীয় চার্চের আর একটা অংশের কেন্দ্র ছিলো এবং তার বিস্তার ছিলো মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে। এই অংশটা বাইজাণ্টাইনচার্চ শাসিত ছিলো। গ্রীক চিন্তাধারার প্রভাব এর ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাসকে বহুভাবে রঞ্জিত ও ফলে বহু ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে ফেলেছিলো। এই বাইজাণ্টাইন চার্চের সংগে ছিলো পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বীতা—এবং দার্শনিক-সম্প্রদায়ের আন্দোলনের (Scholastic Movement) পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিম-ইউরোপে খ্রিস্টীয় ধর্মীয় চিন্তার ধারা ছিলো ট্রাডিশন-আশ্রিত, বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর নয়। এই Scholastic Movement—যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসাবে সেন্ট টমাস আকুইনস্‌ (St. Thomas Acquinas) খ্যাত এবং পিটার আবেলার্ড (Peter Abelard) যার প্রথম নেতা ছিলেন—এর সারভাগ (Essence) ছিলো Greek Dialecties, যার দ্বারা খ্রিস্টীয় ধর্মের বিচার ও সংরক্ষণ হতে পারে। আবেলার্ডের প্রযোজ্য গ্রীক মেথড বা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি সে সময়ে এতোদূর উদারপন্থী ছিলো যে তাঁকে চার্চের কেবল বিরাগ ভাজনই নয়, ধর্মবিরোধী (heretic) আখ্যাও নিতে হয়েছিলো। আবেলার্ড ও তাঁর অনুবর্তীদের শিক্ষার ও আলোচনার কেন্দ্র ছিলো প্যারী শহর এবং তাঁরা মুসলিম দার্শনিক কিন্দি, ফারাবী, ইবনে-সিনা, বিশেষত গাজ্জালীর অনুসৃত গ্রীক দর্শনানুমোদিত পদ্ধতিতে ধর্মতত্বে যুক্তি ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্য-বিধানে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ক্রমশ দেখানো যাবে। তেরো শতকে আরবদের মারফত পশ্চিম ইউরোপ যখন এরিষ্টটলের দর্শন-শাস্ত্রের সংগে একটা মোটামুটি ঘনিষ্টতা স্থাপন করতে সক্ষম হলো তখন এই চিন্তা-পদ্ধতি দিয়ে এবং অদ্ভুত বাহাদুরী ও পরিশ্রমের ফলে রোমান্‌ খ্রিস্ট-ধর্মের একটা সঠিক ও নজীর-নির্ভর প্রমাণ ও সমর্থন খাড়া করা হলো। একথাটি প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করেন যে মুসলমানের মাধ্যমে পাওয়া ও মুসলমানের কাছে শেখা এই গ্রীক-দর্শনের দ্বারা চিন্তাশক্তির বিকাশ না হলে ইউরোপের রেনেসাঁ অন্ততঃ আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে পড়তো। খ্রিস্টজগতের এতোখানি উপকার কি ধর্মচিন্তার দিক দিয়ে, কি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে কম নয়। অধ্যাপক

গীল্যোম্ নিজেই স্বীকার করেছেন মংগল জাতি যেমন বর্বরের মতো নিষ্ঠুর ভাবে প্রাচ্যের জ্ঞানের আলোক নির্বাপিত করে দিয়েছিলো, অসংখ্য লাইব্রেরী ও সাহিত্যিক ট্রাডিশন ধ্বংস করেছিলো, যার দরুন প্রাচ্যের তাহজির ও তমদ্দুনের উৎকৃষ্ট ধারা বহু বৎসর ব্যাহত থাকতে বাধ্য হয়, আরবীয়রাও যদি সেই রকম গ্রীক ও ল্যাটিন জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতি বর্বর ব্যবহার দেখাতো তাহলে ইউরোপে রেনেসাঁর যুগ আরো কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতো। মার্জিত রুচি ও জ্ঞানপিপাসু আরবীদের সংগে মংগলজাতির এইখানেই বিরাট পার্থক্য।

পশ্চিমের দর্শনশাস্ত্রের কোন কোন অংশে মুসলিম তথা আরবী চিন্তাপ্রণালী ও বিষয়বস্তু প্রভাব বিস্তার করেছে, তার যথাযথ আলোচনার গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখা উচিত—দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে (Philosophy and Theology) স্বতন্ত্রভাবে দেখেছেন এমন চিন্তানায়কের সংখ্যা সে যুগে কী প্রাচ্যে, কী পাশ্চাত্যে বেশী ছিলো না। সত্যের মর্মোদ্ঘাটনে বিশ্বাস (Faith) ও যুক্তি (Reason) উভয় সূত্রই যে ন্যায়-সংগত সমান প্রয়োজন, তা প্রায় সকলেই স্বীকার করতেন। ইদানীং যাকে Metaphysics (অধিবিদ্যা) বলা হয়, এরিষ্টটলও তাকে Philosophy ও Theology উভয় অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অধিবিদ্যা ও ঐশী ধর্মের (ইংরাজীতে যাকে Religion বলা হয়) অন্তর্গত বিষয়গুলি নিয়ে বেশ মতানৈক্য ছিলো। রোজার বেকন্ অধিবিদ্যাকে ধর্মতত্ত্বেরই একটা অংশ মনে করতেন—যার উদ্দেশ্য আল্লাহ; তাঁর ফেরেস্তা ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা ও অনুসন্ধান। Moral philosophy (Theologia physica) থেকে পৃথক করার জন্য Metaphysics এর এই অংশকে তিনি Scientia divina নাম দিয়েছেন। তেমনই ইবনে-সিনার মতে সত্তাই (Matter) হলো Metaphysics-এর লক্ষ্য। কিন্তু আবু রুশদ এরিষ্টটলের অনুসরণ করে স্রষ্টা ও পরম গুণ (absolute intelligence)-কেই এর অন্তর্ভূক্ত মনে করতেন এবং তিনি মানুষের বুদ্ধি দ্বারা বিচার্য বিষয় থেকে ঐশীধর্ম ও তার মতকে (dogma) বাদ দিয়েছেন।

দর্শন শাস্ত্রের অনুরাগ যে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা থেকেই জন্ম নেয়, তা বোধ হয় অনেকের জানা আছে। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াতে খ্রিস্টান-সম্প্রদায় যে গ্রীক সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে ধারণ করে আসছিলো এবং যার বলে প্রাচ্য খ্রিস্টান চিন্তাধারায় এরিষ্টটলের ন্যায় ও দর্শন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলো, তার সংগে মুসলমানরা পরিচিত হওয়ার সংগে সংগেই এই যুক্তি-অনুসারী স্বধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার ও সৃষ্টি-রহস্য আবিষ্কার করার স্পৃহা জন্মে। এর মূলে ছিলো কোরআনের শিক্ষার শ্রেষ্ঠতার উপর অগাধ বিশ্বাস। কাজেই ধর্মতত্ব ও দর্শনের সীমারেখা গোড়ার দিকে অস্পষ্ট ছিলো। কিন্তু কালক্রমে

ধর্মতত্ত্ববিদদিগকে 'মুতাকাল্লামুন' ও অধিবিদ্যা বিশারদ জ্ঞানীদিগকে 'ফালাসাফা' বা 'হুকামা' নাম দেওয়া হয়। খ্রিস্টজগতের মধ্যযুগীয় দর্শনের সংগে এই মুতাকাল্লামদের চিন্তাধারায় সুস্পষ্ট যোগ আছে একথা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু আরবী ফালসাফারও যে সরাসরি প্রভাব ইউরোপের দর্শনে মৌলিকভাবে ছিলো তা-ও এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

ওমাইয়া খলিফাদের আমল থেকে গ্রীক ন্যায় ও দর্শনের দিকে আরবীয়দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিছু কিছু তর্জমাও করা হয় সিরীয়াক ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু আব্বাসীয় যুগের পূর্বে এই দর্শন-শাস্ত্রের রূপ স্পষ্ট হয় নি এবং এসম্পর্কে কোনো রচনাও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। খলিফা হারুণ-অল-রশীদ ও অল-মামুনের সময় বাগদাদে বিভিন্ন ভাষা থেকে দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থের তর্জমা করার যেরকম অত্যধিক উৎসাহ ও তৎপরতার পরিচয় পাই এবং খলিফা অল-মামুনের সময়ে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদিতা (rationalism) যেভাবে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাভ করে, তা থেকে গ্রীক, এমনকি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সংগে মুসলমানদের ঘনিষ্ট পরিচয় যে আগেই হয়েছিলো তা সহজেই অনুমেয়। ধর্মতত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে মুসলিম দর্শন ও চিন্তাপ্রণালী গড়ে উঠলো, মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রচারিত যুক্তিবাদে যেমন তার একদিকের ক্রম-বিকাশ হলো, তেমনই সুফিদের আধ্যাত্মবাদে হলো তার অন্যদিকের আসল রূপ-নির্দেশ। স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তাবাদের সংগে ইলাহী সর্বশক্তিমত্তার মিল ও গরমিল কতোখানি, মুতাজিলা সম্প্রদায়ের তাই ছিলো আলোচনার বিষয়। এবং তা থেকে যে তর্কজালের সৃষ্টি হলো নবম শতকের গোড়াতে তা দারুণ বিপ্লব এনে দেয়। এ-বিপ্লবে গোঁড়া শরীয়তপন্থী ও স্বাধীন চিন্তাবাদী মুসলমানদের মধ্যে তাত্ত্বিক মতান্তর ও মনান্তর কিছু কম সংঘর্ষ সৃষ্টি করে নি। এমনকি এক সময়ে 'মুতাজিলা'-শব্দে কেবল মো'মেন-সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষকে বোঝাতো। এদের মতবাদের আলোচনা এখানে অবান্তর, কিন্তু যে ন্যায় ও তর্ক কৌশল তাদের প্রধান অস্ত্র ছিলো তারই প্রয়োগ-বিধি আয়ত্ব করে আবুল হাসান আশআরীর নেতৃত্বে সনাতন-পন্থীরা কী ভাবে সন্দেহ ও বিরুদ্ধবাদিতার কবল থেকে ইসলামের মূল তত্ত্বগুলি সুরক্ষিত করেন এবং যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ইলমুল-কালামের প্রবর্তন করেন তা অনেকেরই জানা আছে। এই কালামের ভিত্তি হলো গ্রীক লজিক বা ন্যায়শাস্ত্র—বুদ্ধি দ্বারা বিচার্য মীমাংসাপ্রণালী, শ্রুতি ও বিশ্বাসের সংগে এর মৌলিক দ্বন্দ্ব নিরসনের যে ইতিহাস তাতে অল-কিন্দি, অল-ফারাবী, ইবনে-সিনা, আবু-রুশদ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরাও যেমন অংশ গ্রহণ করেছেন, তেমনই করেছেন অল-গাজ্জালী, ইবনে-মাসাররা প্রমুখ ধর্মতাত্ত্বিক ও সুফিরা।

সভ্য-জগতে মুতাজিলা-সম্প্রদায়ের দান তাদের বিশিষ্ট মতবাদগুলি নয়, ধর্মতত্বকে মানবীয় যুক্তিতর্কের অধীনে আনয়ন করাই তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। "আল্লা জল্লে জালালহু এরকম আদেশ দিয়েছেন"—একথা বলে তাদের নিরস্ত করা চলবে না। আল্লাহ কে, কেন এরকম আদেশ দিয়েছেন এবং এ আদেশের সার্থকতা কোনখানে—তা-ই তারা বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা হৃদয়ংগম করতে চাইবে। প্রত্যেক ধর্মীয় বিধানকে তারা তর্কের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চেয়েছিলো; জ্ঞান ও দর্শনের বহির্ভূত কোনো বিধানকে ধর্মীয় আদেশ বলে চিৎকার করে তাদেরকে থামানো চলতো না। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের এই শিক্ষাটা খ্রিস্টজগতে, স্বাধীনচিন্তা ও যুক্তিতর্কের ক্রমবিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলো, একথায় সন্দেহের অবকাশ নেই। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের জুলুমবাজীতে খ্রিস্টীয় চার্চগুলি যখন মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে রুদ্ধ ও ব্যাহত করেছিলো, সেই সময়ে মুতাজিলা-সম্প্রদায়ের এরকম বলিষ্ঠ ও সুস্থ মতবাদ প্রচারে ইউরোপীয় চিন্তানায়কগণ অনেকখানি আশার আলোক দেখেছিলেন এবং তারই প্রভাবে নিজেদের যুক্তি-তর্ক আরো শাণিত ও প্রখর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এরিষ্টটলের সহায়তায় অল-কিন্দি তাঁর দার্শনিক মতবাদ ও সৃষ্টিতত্ব-রহস্য (Cosmogony) ব্যাখ্যা করেন। তাঁর রচনার অধিকাংশই আজ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে লুপ্ত কিন্তু একথাটা খাঁটি সত্য যে টমাস আকুইনাস (বারো শতক) পর্যন্ত ইউরোপের সমস্ত দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তানায়কদের উপর কিন্দির মূল-তত্বের (basic principle) একাধিপত্য ছিলো। এরিষ্টটলের দর্শনের প্রথম পরিচায়ক ও ভাষ্যকার হিসাবে ইউরোপ আজো তাঁর সম্মান করে। তবু দেখা গেছে যে পরবর্তী কালে রেনেসাঁর যুগে মূল গ্রীক সাহিত্যের সংগে তুলনায় কিন্দির দর্শনে নিও-প্লেটোনিয়ান (Neo-Platonian) ও এরিষ্টটলের তত্বের কিছুটা অনিচ্ছাকৃত মিশ্রণ ছিলো। আমাদের একথা স্বরণ রাখা উচিত যে কিন্দির রচনার যতটুকু আমাদের হাতে এসেছে তা প্রায় সমস্তই ল্যাটিন অনুবাদের মারফত।

প্রায় তাঁর সমসাময়িক অল-ফারাবীও এরিষ্টটল এবং প্লেটোর ব্যাখ্যা করেন এবং আত্মার প্রকৃতি ও সৃষ্টি-রহস্যের আলোচনায় কিন্দির সিদ্ধান্তকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেন। তাঁর আত্মা, আত্মার গুণাবলী, বোধশক্তি প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশো বছরের মধ্যেই ইউরোপে খ্যাতি লাভ করে। আল্লার অস্তিত্বের প্রমাণ করার যুক্তিসমূহ অল-ফারাবী এরিষ্টটল থেকেই নিয়েছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টিতত্বের আলোচনার কেন্দ্র হচ্ছে একমাত্র আল্লাই—যাঁকে তিনি মূল আত্মা (first soul) বা আদি কারণ (first cause) বলেছেন। অথচ জগতের কোনো চিন্তনীয় আরম্ভ নেই, এ মতবাদেরও তিনি

উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। আরবী ঐতিহাসিকদের মতে কোনো মুসলমান দার্শনিকই ফারাবীর মতো গৌরবময় স্থান অধিকার করতে না পারলেও ইউরোপে তাঁর খ্যাতি কিছু পরিমানে চাপা পড়ে তাঁর পরবর্তী পারস্যবাসী ইবনে-সিনার দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতায় ও পূর্ণতায়। ইউরোপ অবশ্য অন্য কারণেও ইবনে-সিনার কাছে চিরঋণী—চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর রচনাবলী আঠারো শতক পর্যন্ত ইউরোপে পাঠ্য ছিলো। এরিষ্টটলের মতবাদকে সুসংবদ্ধ করে তাঁর চিন্তাধারায় স্রষ্টা (আল্লা) ও মানুষের মধ্যকার শূন্যকে ইবনে-সিনা তাঁর Intelligence of sphere এর বৈজ্ঞানিক ধারণাশক্তি দিয়ে পূরণ করেন। সরল ও সুসমঞ্জস রচনা-কৌশলে তিনি প্রাক্তন দার্শনিকদের মতবাদেরই পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন নি, গ্রীসের সমস্ত দার্শনিক চিন্তাধারাকে নিজের জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে সভ্যজগতের সামনে তুলে ধরেন এবং অধ্যাপক হিট্টির ভাষায়—ইসলামের সংগে গ্রীকদর্শনের সামঞ্জস্য বিধানের যে সূচনা অল-কিন্দি করেছিলেন ও অল-ফারাবী বিকশিত করেন, তা ইবনে-সিনা পাকা ওস্তাদের মতো সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তার দরুন পাশ্চাত্য-দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিলো। বারো শতকের গোড়াতেই টলেডোর আর্কবিশপের প্রেরণায় ইবনে-সিনার গ্রন্থাবলীর ল্যাটিন তর্জমা করা হয়। ইউরোপ ইবনে-সিনার ব্যবহৃত যে-সব ভাব, দার্শনিক পরিভাষা আগ্রহের সংগে গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে 'মাকুলাত'—বুদ্ধি দ্বারা গম্য (intelligible) এবং বস্তুর মৌলিক ধারণার (primary conception) সংগে তাঁর যৌক্তিক ধারণার (logical conseption) পার্থক্য ও এই পরোক্ষ বোধশক্তিই জ্ঞাত থেকে আমাদিগকে অজ্ঞাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাঁর এই বিশিষ্ট মত আলবার্টাস ম্যাগনাস (Albertus Magnus) এর মারফত পাশ্চাত্যের ধর্ম-দর্শনের ঐতিহ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

ইউরোপীয় দর্শনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন স্পেনীয় মুসলিম চিন্তানায়ক ইবনে-রুশদ। প্রায় এরিষ্টটলের মতোই তাঁর সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলি রেনেসাঁর যুগ পর্যন্ত পশ্চিমের দর্শনকে রূপায়িত করেছে। দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশে ইবনে-রুশদের সাক্ষাৎ নেতৃত্ব স্মরণ করেই আধুনিক পণ্ডিতরা তাঁকে প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যেরই চিন্তানায়ক হিসাবে মনে করে থাকেন। আসলে তিনি এরিষ্টটলেরই ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু আপন চিন্তা ও মনীষার সমন্বয়ে দর্শনের যে-রূপ তিনি উদঘাটিত করেন তা পশ্চিমের দার্শনিক মহলে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। যোলো শতক পর্যন্ত Averroism বা ইবনে-রুশদের শিক্ষাপদ্ধতি ইউরোপের চিন্তাধারার সজীব উৎস হিসাবে গণনীয় হতো। আরবীতে লুপ্ত হলেও ল্যাটিন ও হিব্রুভাষা আজো ইবনে-রুশদের গ্রন্থাবলীকে সশ্রদ্ধভাবে ধারণ করে

আসছে। স্বাধীন-চিন্তা ও যুক্তিবাদের নেতা হিসাবে ইবনে-রুশদ খ্রিস্টান ইউরোপকে এতোদূর আকৃষ্ট করেছিলেন যে, বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তিই অধিকতর সত্য এবং দর্শনের প্রতিকূল কোনো প্রত্যাদিষ্ট ধর্মই (Revealed religion) দাঁড়াতে পারে না—এই মতবাদও Averroism নামে তাঁর উপর আরোপ করা হতো। তাঁর রচনা সম্যক অতীত হওয়ার পর অবশ্য আজকাল এ-ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সেযুগে খ্রিস্টান মূল ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যেও যখন ইবনে-রুশদের নাম-মাহাত্ম্যে এই মুক্ত-চিন্তার প্রসার দেখা যেতে লাগলো, তখন চার্চ থেকে ইবনে-রুশদ ও Averroism-এর বিরুদ্ধে নির্দেশ প্রচারের প্রয়োজন হলো। প্যারিসের বিশপ এক দীর্ঘ ফিরিস্তিতে Averroism-সম্পর্কীয় দুশো উনিশটি সূত্রের উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু তবুও ইবনে-রুশদের দর্শন ছাড়া ইউরোপের গতি ছিলো না—আপত্তিকর অংশ ও সূত্রগুলি বাদ দিয়ে ঐ প্যারিসই এরিষ্টটলের দর্শনের উপর ইবনে-রুশদের ভাষ্যগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে নির্দিষ্ট করতে বাধ্য হয়েছিলো। তাঁর যুক্তিবাদিতায় সন্দেহের অবকাশ নেই; কিন্তু তিনি এরিষ্টটলকে তাঁর নামাংকিত অন্যান্য দার্শনিক মতবাদ থেকে মুক্ত করে তার দ্বারা ধর্মকে নির্ভাজ বুদ্ধির আলোকে যাচাই করতে পেরেছিলেন—ধর্মের সত্যতা অস্বীকার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। এই সমন্বয় সাধনে তিনি ইউরোপের যুক্তিবাদী দার্শনিকদের যে কী পরিমাণে সাহায্য করেছেন তার অসংখ্য প্রমাণ টমাস আকুইনাসের লেখা থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেছেন। ইবনে-রুশদের পদ্ধতিতেই আকুইনাস খ্রিস্টান ধর্মের মূলনীতি (dogma) ও বুদ্ধির (reason) সমন্বয়ের চেষ্টা করেন এবং তাঁরই মতো প্রাচীন দর্শনকে অগ্রাহ্য না করে উত্তরকালের চিন্তাধারার আলোকে তাকে যাচাই করতে সচেষ্ট হন। ঐশী-রহস্য উদ্ঘাটনে যুক্তির অক্ষমতা আকুইনাস জোর গলায় বলেছেন, তা ইবনে-রুশদের যুক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। কোরআনের শিক্ষা যেমন দর্শনের বিরোধী হতে পারে না—যেখানে তা মনে হবে সেখানে পাঠকের বোধশক্তিই দায়ী—তেমনই বাইবেলের সংগেও দর্শনের আপাত-বিরোধটা বাইবেলের কথার আসল মর্মোপলব্ধির দোষেই প্রতীয়মান হয় বলে আকুইনাস যুক্তি দেখিয়েছেন এবং উভয়েই প্রত্যাদিষ্ট বাণীর (Revealed text) রূপক অর্থের সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। ইবনে-রুশদের দার্শনিক সূত্রগুলিও আকুইনাস হুবহু গ্রহণ করে নিজের কাজে লাগিয়েছেন। ঐশী জ্ঞানই (divine knowledge) সকল সৃষ্টির আদি কারণ—আকুইনাসের এই প্রস্তাব ইবনে-রুশদের "আল-ইলমুল কাদিমো হুয়া ইল্লাতুন ও সাবাবুন লিল মওজুদ" এই মতবাদেরই অনুবাদ। দর্শনের প্রমাণের পরে কোরআন ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি, স্রষ্টার

অস্তিত্বের প্রমাণে পৃথিবীর সত্তা ও সুনিয়ন্ত্রিত গতির যুক্তি, পৃথিবীর ঐক্য (One world) থেকে আল্লার ঐক্য সপ্রমাণ, প্রভৃতি যুক্তি ও তথ্যগত সাদৃশ্য ইবনে-রুশদ ও আকুইনাসের মধ্যে এতো বেশী রকম পাওয়া যায়, যা থেকে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে ইবনে-রুশদের দান এরিষ্টটলের দর্শনের টীকার চেয়ে যে অনেক কিছুই বেশী, তা সহজেই প্রমাণিত হয়।

রোজার বেকন (Reger Bacon) তাঁর সমসাময়িক দর্শনশাস্ত্রের যে বিবরণী লিখে গেছেন, তা থেকে মুসলিমরা ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে কী পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে, সহজেই বোঝা যায়। তিনি বলেন, নানা কারণে এরিষ্টটলের দর্শন হজরত মোহাম্মদের জন্মের পর ইবনে-সিনা ও আকুইনাস কর্তৃক পাশ্চাত্যে আনীত হওয়ার সময় পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিলো। কিছু কিছু অংশ বোথিয়াস দ্বারা পূর্বে তর্জমা করা হলেও মাইকেল স্কট (Michael Scot) কর্তৃক ইবনে-রুশদের ল্যাটিন তর্জমা থেকেই ইউরোপ এরিষ্টটলের জ্ঞান-সম্পদকে চিনতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ধর্মের সংগে দর্শনের সামঞ্জস্য বিধানের অন্য একরূপ হলো আধ্যাত্মবাদ বা সুফিতত্ব—যার দার্শনিক ভিত্তি নিও-প্লেটোনিক ও এম্পেডক্লিয়ান (Empedoclean) দর্শন ছিলো। এই কাজের একরকম প্রবর্তক ছিলেন স্পেনীয় চিন্তানায়ক ইবনে-মাসাররা (মৃত্যু ৮৮৩ খ্রি.)। তিনি আধ্যাত্মিক নীতিতে সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যা করতেন। দুঃখব্যঞ্জক শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার করে রহস্যময় ধর্ম-দর্শন (Esoteric philosophy) ব্যাখ্যা করার যে নীতি তিনি প্রবর্তন করেন পশ্চিমে ইহুদী পণ্ডিতদের মারফত তা বহু শতাব্দি ধরে কার্যকরী ছিলো। সৃষ্টিতত্ত্বে তিনি প্রথম সত্তার (prime matter) (হ্বায়য়ুলা অল্ আউওল) ব্যাখ্যাই বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ নিয়ে ইহুদী পণ্ডিত ইবনে গেবিরল (Gebirol) পশ্চিমে এই অতীন্দ্রিয় বাদী ধর্ম-দর্শনের প্রচার করেন। তাঁর আরবীতে রচিত 'ইয়াম্বু-উল-হায়াত" প্রায় সংগে সংগেই ল্যাটিন-কৃত হয় এবং সেন্ট-ফ্রান্সিস কর্তৃক ১২০৯ সালে প্রবর্তিত ফ্রান্সিয়ান্ সম্প্রদায়ের মতবাদে গভীর রেখাপাত করে। তেমনই ইবনে-ইজরা, ইবনে-তিব্বন, ইবনে-সাদিক, ইবনে-ইউসুফ প্রভৃতি স্পেনের বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিতরা নিজেদের ধর্ম-দর্শনে ইবনে-মাসাররার এই দার্শনিক নীতি ব্যবহার করেন এবং তার দরুন খ্রিস্টান-দর্শনে ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হতে খুব দেরী হয় নি। বারো শতকের ইহুদী পণ্ডিত মাইমোনাইদ্ স্ও এই রকম ইবনে-রুশদের দর্শনের অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন। ইহুদীদের উপরে মুতাজিলা মতবাদ সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি কোনো 'কালাম' বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা ইহুদী কি মুসলিম, তা রচনার ধারা থেকে আবিষ্কার করা শক্ত হয়ে পড়ে। 'মুতাকাল্লিমুন' দের যুক্তির যে সমালোচনা ইবনে-

রুশদের ও ইবনে-মাসাররার লেখায় পাওয়া যায় তা আকুইনাস বেশীর ভাগই আত্মসাৎ করেছেন।

সৃষ্টি-রহস্যের সংগে ধর্ম তত্ত্বের সমন্বয় চেষ্টাতে আধ্যাত্মবাদের দিকে একদল চিন্তানায়ক ঝুঁকে পড়েন। সর্বেশ্বরবাদ (pantheistic dcetrine) যে কী আশ্চর্যভাবে ইসলামের ধর্মীয় মানসকে বিকশিত করেছে তার আলোচনা পরে করা যাবে। কিন্তু এই সুফিবাদের ভিতর দিয়ে মনস্তত্ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা পদ্ধতি থেকে ইউরোপ কী পরিমাণে লাভবান হয়েছে তার উল্লেখ করা উচিত। ইবনে-মাসাররা, ইবনে-গেবিরল প্রভৃতি একটা গুপ্ত পদ্ধতির (Esoteric) সূচনা করেন, কিন্তু অল-গাজ্জালী সনাতন কালাম ও সুফি-দর্শনের যে মধুর সামঞ্জস্য স্থাপন করেন, বারো শতকে খ্রিস্টান যুক্তিবাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারায় ও পদ্ধতিতে তা অসামান্য স্থান দখল করে। তিনি যে-কাজে তাঁর মনীষা প্রয়োগ করেছিলেন, খ্রিস্টান আকুইনাসও ঠিক তাই করেছেন এবং উভয়ের মতবাদ ও পদ্ধতিতে এতো আশ্চর্য মিল আছে যে আধুনিক সুধিসমাজ গাজ্জালীকে খ্রিস্টান ধর্ম তত্ত্ববিদদের শিক্ষাগুরু বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

আরব-রেনেসাঁর যুগে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের নিকট থেকে দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষালাভ করতে কোনো অহেতুক সংকোচ বোধ করে নি, মুসলমানরাও তাদের উপযুক্ত জ্ঞান-গর্ব নিয়ে খ্রিস্টানদিগকে শিক্ষা দিতে এতটুকু কার্পণ্য দেখায় নি। খ্রিস্টানরা কেবল ব্যক্তিগতভাবেই এই শিক্ষা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট ছিলো না—বিভিন্ন প্রাচ্য-শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করে দলে দলে ইউরোপীয় ছাত্রদিগকে সে-সুযোগ দান করতো। খ্রিস্টীয় প্রচারকবাহিনী (order of preachers) কর্তৃক ১২৫০ সালে টলেডোতে প্রথম প্রাচ্য-শিক্ষাকেন্দ্র (School of oriental Studies) স্থাপিত হয়। রেমণ্ড মার্টিন (Raymund Martin) এই স্কুলের সকলের সেরা ছাত্র ছিলেন। আরবী দর্শনে ও ধর্মমতে তাঁর সমসাময়িক সেন্ট টমাস ব্যতীত আর কেউ আজো পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষতা লাভ করতে পারেন নি। কেবল কোরআন ও হাদিসেই তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিলো না, তিনি অল-ফারাবী থেকে শুরু করে ইবনে-রুশদ পর্যন্ত প্রত্যেক ইসলামী দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকের মতবাদ, তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতামতের অসামঞ্জস্য ও পার্থক্য উপযুক্ত নজীর দিয়ে বিশ্লেষণ করেছিলেন। রেমণ্ড মার্টিনই ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম অল-গাজ্জালীর "তহাফুত অল-ফালাসিফা" বা দার্শনিকদের অসংগতি নামক কেতাবের যথার্থ কদর অনুভব করেন। এই কেতাবখানায় ইসলামী দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মৌলিক বিতর্কের বিশদ আলোচনা আছে। মার্টিন তাঁর pugio fidici নামক গ্রন্থে গাজ্জালীর রচনা থেকে বহু মত অসংকোচে গ্রহণ করেছেন। তারপর থেকে

গাজ্জালীর প্রবর্তিত সত্তাহীনতায় সৃষ্টির আবির্ভাব, অনু-পরমানুতেও আল্লার অস্তিত্ব জ্ঞান, রোজ-কেয়ামত (day of judgment) প্রভৃতি সম্পর্কে মতামত খ্রিস্টানরাও নানা যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়ে আলোচনা শুরু করেন। রেমণ্ড মার্টিন গাজ্জালীর দার্শনিকদের প্রতি আক্রমণাত্মক রচনাবলী Ruina sue praecitium philosophorum নাম দিয়ে তর্জমা করেন। গাজ্জালীর মনস্তাত্বিক ও আধ্যাত্মিক রচনাবলী আজো পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে নানা দৃষ্টিভংগির ভিতর দিয়ে সেখানকার সুধী সমাজ শ্রদ্ধার সংগে পাঠ ও আলোচনা করে আসছেন।

অধ্যপক হিট্টি বলেন মুসলিম চিন্তানায়কদের কাছে এরিষ্টটল ছিলেন সত্য, প্লেটো ছিলেন সত্য এবং কোরআনও ছিলো সত্য—অথচ এই তিন সত্যেরই তো একই রূপ। অতএব এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দরকার হলো এবং একাজেই মুসলিম চিন্তানায়করা আত্মনিয়োগ করলেন। খ্রিস্টীয় যুক্তিবাদীরাও ঠিক এই সমস্যার সম্মুখীন হন, কিন্তু তাঁদের ধর্মতত্বে অন্ধ গোঁড়ামী ও উপকথা বড়ো বেশী জমে যাওয়ায় তাঁদের কাজ আরো কঠিন হয়ে উঠে। গ্রীকদের সাধনা-লব্ধ জ্ঞান-দর্শন এবং হিব্রু পয়গম্বরদের প্রচারিত একেশ্বরবাদ ধর্ম প্রাচীনকালের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সবচেয়ে গৌরবময় উত্তরাধিকার, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধ্যযুগে বাগদাদের ও আন্দালুসের মুসলিম চিন্তানায়কদের শাশ্বত গৌরবের কাজ হচ্ছে এই দু'টি চিন্তাধারাকে একীকরণ করা এবং তারপর সুসমঞ্জসভাবে ইউরোপকে পরিবেশন করা। পরবর্তীকালের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় এ-দানের অতুলনীয় সাফল্য বিবেচনা করেই তার গুরুত্বের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত বহু প্রগতিবাদী হয়তো মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক দার্শনিকদের চিন্তা ও মতবাদে ইসলামের দান কতোখানি সে সম্বন্ধে উল্লেখমাত্রেই নাসিকা কুঞ্চন শুরু করবেন। কিন্তু বিংশ শতকের খ্রিস্টানজগত যেসব সৃষ্টিধ্বংসী, মানবতার অকল্যাণকর সংগ্রাম সংঘাতের ভিতর দিয়ে অনু-পরমানুতাত্বিক অদ্ভুত ও অপূর্ব কালচারের নমুনা দেখিয়েছে, তাতে আমাদিগকে হতাশায় স্তব্ধ হতে হয়। এই অদ্ভুত কালচার আজ নয়াভাবে মধ্যযুগের বহুবিতর্কিত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে দর্শন অথবা ধর্মতত্ব আমাদের একক উপদেষ্টা অথবা 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচ্ছত্র রাণী' হবে? মধ্যযুগীয় ইসলাম ইহুদীদের মারফত খ্রিস্টজগতকে ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়েই বারে বারে এই প্রশ্নের জওয়াব শেখাতে চেয়েছিলো এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে তার মীমাংসা অনুধাবন করতেও অনুপ্রাণিত করেছিলো।

হৃদয়বৃত্তি থেকে সঞ্জাত যে মরমীয়া-বাদ ইসলামে সুফিধর্ম নামে পরিচিত সেই আবেগপ্রধান অনুভাবের কী পরিমাণ প্রভাব পশ্চিমে হয়েছিলো তার

আলোচনায় মনে রাখা উচিত যে অনুভূতির সাক্ষাৎ আদান-প্রদানের কোনো নজীর থাকে না, থাকতেও পারে না। সকল ধর্মেই দেখা যায়, একদল ভাবুক ও মরমীয়াবাদী নীরব উপাসক থাকেন, যাঁরা ধর্মের আনুষ্ঠানিক খোলসটা ত্যাগ করেন এবং বিভিন্ন মত ও পথের বিতর্ক-কণ্টকিত পথ ত্যাগ করে সহজভাবে আল্লার রাহে ধাবিত হন—তাঁদের সারা তনুমন আল্লার প্রেমে এতোদূর ভরপুর হয়ে উঠে যে বাহ্যিক জগতের দেনা-পাওনার সংগে তাঁদের বড়ো একটা সম্বন্ধ থাকে না, কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকের অনুপম সৌন্দর্যে তাঁদের সব সত্তা আলোকিত হয়ে যায়। ডাক্তার নিকলসনের Studies in Islamic Mysticism-এর সংগে যে কোনো খ্রিস্টীয় মিষ্টিসিজমের চলতি কেতাব, অথবা মার্গারেট স্মিথের রাবিয়া বসরীর সংগে ইলিভ্যান আণ্ডারহিলের সেন্ট থেরেজার জীবনীর আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে মিষ্টিসিজমের ক্ষেত্রে কোনো দেশগত বা ধর্মগত পার্থক্য নেই—কে খ্রিস্টান ও কে মুসলিম, চেনাই অনেক সময় শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আট শতকে রাবিয়া বসরী আল্লার দরবারে আরজি করেছিলেন

যদি আমি দোজখের ভয়েই তোমার সাধনা করে থাকি,
তবে আমাকে দোজখেই পুড়িয়ে ফেলো;
যদি আমি বেহেস্তের লোভে তোমার গুণগান করি,
তবে আমায় সে-বেহেস্ত থেকে বঞ্চিত করো;
কিন্তু যদি তোমাকে পাবার আশায় তোমার সাধনা করি,
তাহলে তোমার চির-সুন্দর রূপরাশি
আমার চক্ষু থেকে লুপ্ত করো না।

আর ৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'আনাল-হক' মন্ত্রের উদ্গাতা শহীদ মনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন

আমিই সেই যাকে আমি ভালবাসি,
আমি যার অনুরাগী সে তো আমিই;
আমরা তো দু'টি জীবন একই দেহে বাস করি,
তুমি যদি আমায় দেখো, তাহলে তারই দিদার পাবে;
আর তুমি যদি তার দিদার পাও,
তাহলে তুমি আমাদের দু'জনকেই দেখবে।

কাজেই স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির এই তনুমনপ্রাণ-লয়কারী অবিচ্ছেদ্য শাশ্বত মিলন-আকাঙ্ক্ষা সবধর্মের মরমী উপাসকদের মধ্যে দেখা যায়।

ইসলামের প্রথম থেকেই এই রকম একদল ভাববাদী মরমী আল্লার বান্দার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য ধর্মের ও অন্য দেশের মরমবাদী সাধকদের প্রভাব

এসব সুফিদের মত ও পথের উপর কতোখানি বিস্তার করেছিলো, এখানে তাঁর আলোচনার উপযুক্ত স্থান নয়। সুফিদের প্রভাব খ্রিস্টজগতে কতোটুকু ছড়িয়ে পড়েছিলো তাই আমাদের আলোচনার বিষয়। একথা অস্বীকার করা চলে না যে মিষ্টিসিজমের উন্মুক্ত ক্ষেত্রেই খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম পরস্পরকে বড়ো কাছাকাছি স্পর্শ করেছিলো—সেন্ট টমাস আকুইনাস, একহার্ট (Eckhart), দান্তে প্রভৃতি সুফি-মতবাদে রীতিমতো প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। নয়-দশ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যে প্রায় একইরূপ সংসার-বিরাগী, তপস্বী, ভক্ত ও প্রেমিক সাধকদের দৃষ্টান্ত থেকে কোনও সাক্ষাৎ প্রভাব সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্ত করা যায় না। অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আল্লার অনুগ্রহ লাভ করার চেয়েও যে অন্য আসল ও শ্রেষ্ঠতর উপায়ে তাঁর দিদার লাভ করা যায়, এমতে বিশ্বাসী লোক সকল ধর্মে সকল যুগেই পাওয়া যায়। আনুষ্ঠানিক ধর্মের সংগে এদের একটা চিরন্তন দ্বন্দ্বও সকল সমাজে আছে; ইসলামে এই মরমীদের সংখ্যাবৃদ্ধির এবং প্রকৃত ও তথাকথিত নীতি-শৈথিল্যে শরীয়তপন্থীদের যে প্রতিকুলতা মুসলিম সমাজকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে, তার নিরসনের জন্যই সুফিমতবাদে তত্ত্বের উদ্ভব হয়—কোরআনের মধ্যে আধ্যাত্মবাদের, গোপন নিরুক্তির সন্ধান আরম্ভ হয় এবং নবলব্ধ গ্রীক-দর্শনের কাঠামোতে আনুষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক (শরীয়তী ও মা'রফতী) ইসলামের সমন্বয়ের চেষ্টা হয়। একাজে অল-গাজ্জালী মুসলিম ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ঠিক এই সমস্যা খ্রিস্টানসমাজেও দেখা দেয় এবং সেখানে তার মীমাংসাতেও অল-গাজ্জালীর—যাঁকে ইউরোপ Abuhamet বা Algazel নামে জানে—প্রদর্শিত পথ ও মীমাংসাই পুনরায় ব্যবহার করা হয়, একথা আজ আর তর্কের বিষয় নয়।

সুফি ও সুফিতত্ব প্রথম যুগে শরীয়তপন্থী মুসলমানদের সুনজর আকর্ষণ করতে পারে নি। 'হুজ্জাতুল ইসলাম' অল-গাজ্জালী সর্বপ্রথমে যুক্তি-তর্কসহকারে সুফি মতবাদ সমর্থন করেন এবং শরীয়তপন্থী মুসলমানদের দৃষ্টি পথে সুফিতত্ত্বের উজ্জল দিকটা তুলে ধরেন। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের চেয়েও ক্ষুরধার যুক্তিবাদী অল-গাজ্জালীর সুফি-মতবাদে দীক্ষিত হওয়া এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু তিনি যুক্তিতর্ককে নীরস ও অনুর্বর ক্ষেত্রে না ফেলে ঐশ প্রেমামৃতে সঞ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। এইটাই তাঁর চিন্তাধারার ও সাধন মার্গের অমৃতময় যোগাযোগ এবং তার দরুনই তিনি অনুষ্ঠান-পীড়িত, রুক্ষ, কঠোরপন্থী শরীয়তী ইসলামে প্রাণসঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর ভাবের ও প্রেমের বন্যায় শুধু ইসলামজগত মাতোয়ারা হয়ে উঠেনি, খ্রিস্টজগতেও বেশ আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলো। তাঁর পরে ইবনুল-আরাবীর আবির্ভাব হয়। তাঁর প্রভাবে সুফিতত্ব আর

হৃদয়ের ও অনুভূতির ব্যাপার রইলো না, তিনি বিশ্বনবীকে শাশ্বত কামেল (perfect) মানুষরূপে দেখলেন—যাঁর মধ্যস্থতায় ইলাহী করুণারাশি প্রতিনিয়ত সৃষ্টির বুকে ঝরে ঝরে পড়ছে ও এই দুনিয়া তার ফলে নিরন্তর প্রাণবন্ত ও প্রতিপালিত হচ্ছে। ইবনুল-আরাবীর সুফি-তত্ত্বে সর্বেশ্বরবাদের যে আভাষ দেখা যায়, তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত কবি ও সুফি জিলি, রুমী, হাফিজ ও আত্তারের সাধনায়ও তার পূর্ণরূপ দেখা যায়। ইবনুল-আরাবী স্পেনীয় ছিলেন, তার দরুন তাঁর সুফিদর্শন পাশ্চাত্যের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশেষতঃ তাঁর doctrine of unity of Existence (ওহদাত-অল-ওজুদ) খ্রিস্টান ধর্মতাত্বিকদের প্রভূত সাহায্য করেছিলো। রেনেসাঁর যুগ পর্যন্ত ইউরোপের মানসে ইবনুল-আরাবীর রচনাবলী ও সুফিদর্শন কী পরিমাণ রেখাপাত করেছিলো, দান্তের লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে সাহিত্যের অধ্যায়ে বিস্তৃত উল্লেখ করা হয়েছে।

খ্রিস্টীয় ও ইসলামী মিষ্টিসিজমে মধ্যযুগে কতোখানি যোগাযোগ ছিলো, জামীর এই একটি বয়াতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়

হে আল্লাহ, কেবল তুমি ছাড়া আর কেউ তোমার তল খুঁজে পায় না,
তবু প্রত্যেক মসজিদে ও প্রত্যেক গির্জাতে তোমারই খোঁজ করা হয়।

সমাজ-নীতি ও ব্যবহার-নীতি

হজরত মোহাম্মদ সর্বপ্রথমে আরব দেশেই প্রচার কার্য আরম্ভ করেন এবং মুসলিম-সমাজ তাঁর অসাহাবা-অনুগামীদিগকে নিয়েই প্রথমে সৃষ্ট হয়। তার দরুন মুসলিম-সমাজের মূল কাঠামো আরব জাতির সামাজিক রীতি-নীতি থেকেই লওয়া হয় বললে ভুল হয় না। আরব-জাতিটাই একটা বিরাট পরিবার ছিলো বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন আরব-সমাজ রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয়তার উপর গঠিত ছিলো। কতগুলো লোক কোনো প্রসিদ্ধ পুরুষ থেকে উদ্ভুত হিসাবে দাবী করতো এবং পারস্পরিক সাহায্য ও আত্মরক্ষার তাগিদে সকলে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকতো। তাদের দেব-দেবী পূজা-পদ্ধতি এক ছিলো। তাদের এই রক্ত ও বংশগত বন্ধন এতো সুদৃঢ় ছিলো যে, বংশের নগণ্যতম ব্যক্তির প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে সকলেই অকুণ্ঠচিত্তে আগুয়ান হতো—একের অসম্মান ও অপমানে সমগ্র সমাজ চঞ্চল হয়ে উঠতো। হজরত মোহাম্মদ এই মূল আদর্শটি একান্তভাবে গ্রহণ করেছিলেন—কেবল রক্তের সম্বন্ধ বাদ দিয়ে ধর্মের বন্ধন আনয়ন করেছিলেন। অতএব নবগঠিত মুসলিম সমাজ থেকে পুরাকালের বংশগত ও সম্প্রদায়গত বন্ধন একেবারে খসে পড়লো—জন্মগত, বংশ ও রক্ত সম্বন্ধীয় সবরকম পরিচয় ধূলায় লুটালো। একবার ইসলাম-ধর্মে বিশ্বাসী হলে মুসলিমকে সকল রকম সম্পর্ক ভুলে যেতে হয়—অতি নিকট আত্মীয়-স্বজন যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তারাও পর হয়ে যায়। হজরত ইবরাহিমের সাথে সুর মিলিয়ে সেও বলতে পারে   তোমার ও আমার মধ্যে আর কোনো সংযোগ নেই।

ধর্মীয় বন্ধনের ভিতর দিয়ে সমাজ গড়ে তোলার অভিনব রীতি খ্রিস্টজগতেও সংক্রামিত হয়ে পড়েছিলো বলে অনুমান করা যেতে পারে। মধ্যযুগে খ্রিস্টজগতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় (friars) গড়ে উঠে, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য-জ্ঞান

ঠিক ইসলামের অনুকরণে তীব্র ও সুদৃঢ় ছিলো—যার ফলে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হিসাবে নিজদেরকে জ্ঞান করতো।

জগতের সকল মুসলিমেরই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল রকম ক্রিয়াকর্ম ইসলামী বিধি ব্যবহার দ্বারা অনুশাসিত। তার দরুন এই বিরাট মুসলিম-গোষ্ঠির মধ্যে এরকম একটা সংযোগ সূত্র রয়েছে এবং আচার-নীতির এরকম একটা ক্ষমতা রয়েছে যে, তার ফলে ভারত-মালয়বাসী, আরব ও আবিসিনিয়াবাসী এবং চীন ও তুর্কবাসী একটা বিরাট মানব-গোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছে। ধর্মের বাঁধন দিয়ে ইসলাম দেশগত, বর্ণগত বৈষম্য মুছিয়ে ফেলে সকলকে এক মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে। দুনিয়ার যে-কোনো দেশেই মুসলিম বাস করুক না কেন সব জায়গায় তার সামাজিক রীতি-নীতিতে এরকম বৈষম্যহীন সমতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো।

এই বিরাট মুসলিম-গোষ্ঠিতে-সকলেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন আছে—নর ও নারী ভেদে এ-অধিকার বড়ো ও খাটো করা হয় নি। মুসলিম-মাত্রেই সমাজের বিশিষ্ট অংগ এবং সে তার স্বাধিকার আপন ধর্মমতের অধিকার দ্বারাই অর্জন করে। এজন্য তাকে মাত্র দু'টি বিষয়ে একমত হতে হবে—আল্লার একত্বে বিশ্বাস এবং হজরত মোহাম্মদকে তাঁর শেষ রসুল হিসাবে স্বীকার করা। এই সমাজের আদর্শ স্বতন্ত্র। প্রত্যেকেরই উপরে জগতের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করবার গুরুভার কর্তব্য রয়েছে, সকলেরই সমান অধিকার আছে এবং সমান কর্তব্য-পালনের অনুশাসনও আছে। এজন্যই প্রত্যেক মুসলমান 'ভাই ভাই'। একদা বিশ্বনবী বলেছিলেন, "মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া, সম্প্রীতি ও সমবেদনা থাকবে, যেমন থাকে, একটি মানবদেহে যদি একটি অংগে আঘাত পায় তবে যেনো সর্বশরীরে তা অনুভূত হয়" (বোখারী ৩ ৬)। এই মূলমন্ত্রটি সাধারণ ও ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম সমাজে দৃষ্ট হয়। ভ্রাতৃত্বের এই অপূর্ব বন্ধন থেকেই সাম্য-নীতির উদ্ভব। আল্লার কাছে সকলেই সমান, অতএব মুসলিম মাত্রেরই অধিকার সমান—পৌরজীবনে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কোথাও কোনো বৈষম্য বা তারতম্য নেই। এই সমতা ও একতার সহজ আদর্শ থেকেই মুসলিম সমাজ-নীতি গড়ে উঠেছে। শরীয়ত বা ইসলামী ব্যবহারশাস্ত্র এরূপেই মানুষের প্রকৃতিগত দাবী ও অধিকার এবং তার কর্তব্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। এই দাবী, অধিকার ও কর্তব্য শাসক ও শাসিত এবং স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে কম-বেশী বা পৃথক করা হয়নি। এজন্যই মুসলিম রাষ্ট্রে শাসকের বিধিদত্ত অধিকার (civine right) বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই বা তাঁর কোনো prerogative বা বিশেষ অধিকারও নেই। তাঁর কোনো বিশেষ সিভিল লিষ্ট (civil list) নেই—মানুষ হিসাবে তাঁর অধিকার অন্য সকলেরই মতো। গণতন্ত্রের এই অপূর্ব ও শ্রেষ্ঠনীতি

ইউরোপ একাধিক বার গ্রহণ করেছে, প্রত্যেক যুগেই তার প্রভাব ইউরোপীয় রাষ্ট্র-তন্ত্রে লক্ষ্য করা গেছে। তুর্কীর মশহুর মহিলা খালেদা এদিব এই প্রভাবটাকেই লক্ষ্য করে বলেছেন ইসলাম ধর্মের বেদীমূলে যে-শিক্ষা দান করেছিলো, ফরাসি-বিপ্লব রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সেই শিক্ষা দান করেছিলো এবং বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়া অর্থনৈতিক ভিত্তিমূলেও সেই শিক্ষা দিতে চায়।

মানুষকে অহেতুক কৃচ্ছতা-সাধনের জন্য বাধ্য না করে এবং কারো প্রকৃতিদত্ত ও স্বভাবগত ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষুণ্ন না করে শরীয়ত মুসলিম-সমাজকে প্রাণময়, কর্মময়, প্রগতিশীল ও চির-উন্নত করবার উপযুক্ত বিধান দিয়েছে। বেঁচে থাকাই জীবধর্ম। কিন্তু মানুষের কেবল তাতেই তৃপ্তি আসে না। সে চায় বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে; তার শিক্ষা, ধর্ম, রুচি ও সংস্কারের সংগে সংগতি রেখেই বেঁচে থাকতে চায়। তার দরুন জীবনে শত-সহস্র সমস্যার উদ্ভব হয়, তাকে শত প্রকার সংগ্রাম-সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তাতে তার ভয় পেয়ে পিছিয়ে পড়লে চলবে না—সংগ্রাম-সংঘাতের মধ্য দিয়েই সকল সমস্যার সমাধান করে তাকে মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে যেতে হবে। Survival of the fittest বা যোগ্যতমেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে—প্রকৃতির এই ক্রুর নীতি ইসলাম অস্বীকার করেনি এবং এজন্য ইসলাম মানুষকে নিষ্ক্রিয়ভাবে আধ্যাত্মিক পথের অনুসারী না হয়ে সক্রিয় ও কর্মঠভাবে প্রকৃতির ধনভাণ্ডার দু'হাতে লুটে ভোগ করবার শিক্ষা দান করেছে। ইসলামী সমাজের এই কর্মময়, প্রাণময়, প্রগতিশীল ও উন্নতিকামী জীবন ধারা ইউরোপীয় সমাজকে অনেকখানি নাড়া দিয়েছিলো, তার আধা-জড় দেহে অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলো। আধুনিক ইউরোপীয় সমাজে উন্নততর জীবন যাত্রার মান গড়ে তুলতে ইসলামের এই মূল আদর্শটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, এ কথায় সন্দেহ মাত্র নেই।

ইসলাম প্রত্যেক কার্যকরী ও উৎপাদনকারী ব্যবসায় অবলম্বন করতে মানুষকে বারবার আদেশ দিয়েছে। তার দরুন চাষের কাজ, সওদাগরী, তেজারতী ও অন্যান্য কায়িম পরিশ্রম-সাপেক্ষ বৃত্তিকে উচ্চভাবে প্রশংসা করেছে। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাকে অথবা অন্যের উপার্জনে ভাগ বসিয়ে খাওয়া-পরা চালানোর হীন মনোবৃত্তিকে ইসলাম ঘৃণার চোখে দেখেছে। ইসলাম প্রত্যেককেই নিজ পরিশ্রম-লব্ধ উপার্জন দ্বারা রুজী রোজগার করতে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছে এবং এজন্য মানুষকে সবরকম বৃত্তি অবলম্বন করে অপরকে অহেতুক কৃপালাভের হীন মনোবৃত্তিকে দমন করতে বিশেষ অনুশাসন দান করেছে। এইদিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম মানুষের কর্মধারাকে সংকুচিত বা রুদ্ধ না করে সবদিকে প্রসারিত করেছে এবং তার দরুন আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম ব্যবস্থাদাতারা মানুষের অকুণ্ঠ স্বাধীনতা ও ইচ্ছাশক্তির নিরঙ্কুশ মুক্তিরই কল্যাণকর

শিক্ষা দান করেছেন। তবে এই স্বাধীনতা আবার একেবারে নিরঙ্কুশ হলে মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়ে; কারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতিগত স্বার্থপর ও অকৃতজ্ঞ—অপরের অধিকারের উপর তাদের অযথা লোভ ও হিংসা আছে। আবার অনেকেই স্বভাবত অলস, সেজন্য আল্লাহ তাদের জন্য যেসব রহমত অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন, তারা যে সব নিজের হাতে কুড়িয়ে ভোগ করার চেয়ে অপরের মুখ চেয়ে থাকতেই ভালবাসে। অতএব প্রকৃতিগত নিয়মানুসারে যদি সকলকেই অবাধ গতি ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে অনিয়ম ও অত্যাচার মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং তার বিষময় ফলে মানব-জীবন পংগু ও অচল হয়ে পড়বে। এজন্যই শরীয়তে কতকগুলি 'হুকুম' বা অনুশাসন দ্বারা মানুষের কর্মধারাকে 'হদ' বা সংযত ও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেকেই আপন আপন সীমানা লঙ্ঘন করতে না পারে এবং যাতে মানব-সমাজে প্রত্যেকেরই মর্যাদা ও অধিকার রক্ষিত ও পালিত হয়। "মানুষ স্বভাবত সামাজিক জীব, অন্য প্রাণীদের ন্যায় সে একাকী বাস করতে পারে না—সে অপরের সংগ ও সাহায্যের একান্ত প্রত্যাশী" (দর্‌রুল-মোখতার)। কিন্তু প্রত্যেকেরই রুচি সমান নহে, তার অভাব-অভিযোগও বিভিন্ন, অথচ প্রত্যেকেরই যোগ্যতা ও শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার দরুন প্রত্যেক মানুষকে অপরের সাহায্য প্রত্যাশা করতে হয় এবং এ জন্যই মানব-সমাজে স্বার্থগত, সম্বন্ধগত আদান-প্রদানের সমস্যা চিরদিনই উদ্ভব হয়। এই সকল সমস্যা সমাজ-গঠনের আদিকাল থেকেই দেখা দিয়েছে এবং পৃথিবীর কালপ্রবাহে বিবর্তনের সংগে সংগে যুগে যুগে নানা রূপ নিয়ে দেখা দেবে। শরীয়ত এই কালগত বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই মানুষের সকল সমস্যার পূরণ ও সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। এজন্যই ইসলামী ব্যবস্থা-শাস্ত্র বা 'শরীয়ত' প্রগতিশীল, কারণ এর উদ্দেশ্য হলো সামাজিক জীবনকে উন্নত করা। কোনো ইউরোপীয় লেখক বলেছেন সমাজের উন্নতির দিকে লক্ষ্য থাকায় মুসলিম আইন আমাদের ন্যায় প্রগতিশীল। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে ইউরোপ ইসলামের কাছ থেকেই আইনের এই প্রগতিমূলক আদর্শ ও প্রেরণা লাভ করেছিলো।

আইন কথা ও যুক্তি থেকে উদ্ভূত, তার দরুন আইন বিজ্ঞান-সম্মত। আইন অপরিবর্তনীয় নয় এবং কেবলমাত্র জনশ্রুতি, সংস্কার, আচার ও প্রচারের উপর নির্ভরশীল নয়। সকল ব্যবস্থাদাতাই এবিষয়ে একমত। হানাফীরা বলেন আইন ও নিয়ম অপরিবর্তনীয় নয়। এগুলো ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্রের মূলসূত্রের অনুরূপও নয়। যা-কিছু ঘটেছে ও যেভাবে তার পরিবর্তন হচ্ছে, আইন তারই উল্লেখ ও সমর্থন করে মাত্র। আইন প্রয়োগ কালেও পরিবর্তিত হয়ে থাকে, হানাফী ও মালেকী মজহাবীগণ একথাও স্বীকার করেন। সমাজের ও সমাজের প্রত্যেক অংগের উপকারিতা ও সুবিধাই ব্যবস্থাপকের প্রধান লক্ষ্য। আরব জাতিটা

আইনের এই পরিবর্তন ও নমনীয়তার স্বরূপ পরিষ্কারভাবেই বুঝেছিলো। আইন আবার রীতিও বটে। সমাজ একটা জীবন্ত প্রতিষ্ঠান, ক্রমাগত তার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আদি পিতা হজরত আদমের সময় মানুষের অবস্থা দুর্বল ও দুঃখময় ছিলো। তখন ভাই-ভগ্নির মধ্যে বিবাহ আইন সম্মত ছিলো এবং আল্লাহ তখন মানুষকে বহু বিষয়ে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তারপর সমাজ বিস্তৃত ও উন্নত হলো, অনুশাসনের সংখ্যাও ক্রমে বেড়ে গেলো। জীবনের এই ধারাবাহিক গতি জাতির ইতিহাসের ধারায় লক্ষ্য করা যায়। এই ধারাকে ইসলাম একান্তভাবে মেনে নিয়েছে।

সমাজ-জীবনের মধ্যে কতকগুলো সম্বন্ধ অত্যাবশ্যকরূপে স্থাপিত হয় এবং এসকল সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলো অনুশাসন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। নর-নারীর মধুর মিলনে মানব সমাজ সতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই মিলিত নরনারীকে কেন্দ্র করেই পারিবারিক জীবন গড়ে উঠে। এজন্য বিবাহিত জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং পারিবারিক জীবন সংগঠন ও সুখ-সুবিধার জন্য বিধি-নির্দেশ সৃষ্ট হয়েছে। শ্রমের বিভাগ হেতু এবং নানারকম অভাব ও প্রয়োজন মেটাতে মানুষকে সর্বদাই অন্যের সংগে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ করতে হয়—তার দরুন আমাদের মধ্যে সাধারণ ব্যবহারিক আইন, লেন-দেন সম্বন্ধে আইন কানুনের উদ্ভব হয়েছে। মুসলিম সমাজ নীতির বৈশিষ্ট এই যে, ইসলাম সকল রকম অনুশাসনই মানুষের প্রকৃতিগত সুবিধা ও স্বভাবগত যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখেই বিধিবদ্ধ করেছে। মুসলিম চুক্তি-বিষয়ক আইনও এই মূলনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই প্রকৃতিগত অধিকার বলে অপরের সংগে যে-কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু এই অধিকারকেও অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিকারীর কল্যাণার্থে ক্ষুণ্ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নাবালক, বিকৃত মস্তিস্ক, চিররুগ্ন, মদ্যপায়ী, অমিতব্যয়ী ও দেওলিয়া ব্যক্তিদের উপকারের জন্য এই অধিকার বিশেষ বিধি দ্বারা সংযত করা হয়েছে, কারণ এই শ্রেণীর মানুষ কখনো ভালোমন্দ বা অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কোনো কাজ করতে সক্ষম নয়। প্রত্যেক মানুষই আপন 'অধিকার' ভোগ করতে পারে, কারণ অধিকার থাকার তাৎপর্য হচ্ছে অধিকারীকে তা পূর্ণভাবে ভোগ করার সুযোগ দান করা। কিন্তু এই অধিকারও সংযত করা দুই ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠে—কেউ নিজের অধিকার এরকমভাবে ভোগ করতে পারে না যার দরুন তার নিজের বা অন্যের কোনো উপকার হয় না এবং অপরের ক্ষতি না করে কিংবা অনুরূপ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করে আপন অধিকার ভোগ করতে পারে না। এই বিধি মানব সমাজের সকল স্তরেই প্রযোজ্য। এজন্য ইসলাম স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, সন্তানের প্রতি পিতামাতার, ভৃত্যের প্রতি প্রভুর সম্পর্কে এবং অন্যান্য পারিবারিক, প্রতিবেশীর ও সামাজিক জীবনে একের প্রতি অন্যের

অধিকার সংগতভাবে সংযত করে দিয়েছে। মানুষের অধিকার এরূপ অবস্থা ও প্রকার ভেদে সংযত ও ক্ষুণ্ন করবার বিধান না থাকলে মানব-সমাজ লোপ পেতো। ইসলাম সমাজ জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োজন অনুযায়ী এই মূল সূত্রটির দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবন অতি সরল ও সহজভাবে বিধিবদ্ধ করেছে। এজন্যই শরীয়তকে 'শারিয়া' বা সরল পথ বলা হয় এবং প্রত্যেক মুসলমানই এই সরল পথের অনুসারী হতে বাধ্য।

মুসলিম সমাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের সংগে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে উঠেছে। ইসলাম আল্লার অধিকার থেকে মানুষের অধিকার ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেনি। এজন্য ইসলামী বিধানমতে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য আল্লার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, polis, civitas, state বা রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা নয়। মুসলিম ব্যবহার-শাস্ত্রে ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট আছে সত্য, তবে তার দরুন মানুষের জীবন-যাত্রার পথ সংকীর্ণ ও রুদ্ধ করে ফেলা হয়নি, বরং এই প্রভাব দ্বারা ব্যবহার-শাস্ত্রকে নৈতিক নিয়মাধীনই করা হয়েছে। যৌথ কারবার, ঋণদান, সাক্ষ্যবিষয়ক আইন, প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক, বাদী-প্রতিবাদীয় সম্বন্ধ, মানুষের বাহির-বিশ্বের সংগে আদান-প্রদান ও ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কীয় সকল বিষয়েই এই নৈতিক অনুশাসনের দিকে প্রবল ও সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। যে-ব্যক্তি জেনে শুনে অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করে তাকে দুই দিকে জবাবদিহি করতে হয়—আল্লার কাছে অন্যায় কাজ করার জন্য এবং যার জিনিস আত্মসাৎ করলো তার কাছে প্রতারণার জন্য। যে ঋণী সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মহাজনকে সমস্ত শোধ দেয় না, কিংবা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে সে নিশ্চয়ই মহাপাতক এবং আল্লার কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দেবে? যার সম্পত্তি আপরে বলপূর্বক আত্মসাৎ করলো তার আপন সম্পত্তি দাবী করা ও খাস দখলে আনা তার পক্ষে 'ফরজ' বা অবশ্য কর্তব্য। কারণ সে চুপ করে থাকলে আপন অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো এবং এভাবে আল্লার সওগাত অবহেলা করলো। তার উপর সে অন্যায়কারীকে তার সম্পত্তি ভোগ করবার সুযোগ দিয়ে ক্রমাগত তাকে অন্যায় করতে উৎসাহিত ও তার কাজে সহায়তা করলো। হজরত মোহাম্মদ বলেছেন যখন তোমার ভাই অন্যায় কাজ করে, তখনও তার উপকার করো এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাকে সবলে বাধা দিয়ে দুষ্কার্য থেকে বিরত করাই তার প্রকৃত সাহায্য করা।

প্রত্যেকের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে সেরকম দায়িত্বও রয়েছে—তার হক-হকুক তার দায়িত্বের দ্বারাই সংযত হয়ে থাকে এবং সমাজ ও নৈতিক জীবনের ধারাগুলি তাকে অহরহ আপন অধিকারের অপব্যয় ও অপপ্রয়োগ না করবার জন্যই বাধা দিয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে সর্বদাই আপোষ করবার সদিচ্ছা থাকা উচিত, কারণ মিলনপন্থী ও শান্তিপ্রিয় হলেই মনের তিক্ততা একেবারে লোপ

পায় এবং সামাজিক জীবনে প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর ও মধুময় হয়ে উঠে। ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে তোমারা তাদের মতো হয়ো না, যারা পরিষ্কার যুক্তি শুনেও বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ভিন্নমত গ্রহণ করে, তারা নিশ্চয়ই গুরুতর শাস্তি পাবে (কোরআন, ৩ ১০)। ইসলাম প্রতিশোধ গ্রহণ করবার প্রবৃত্তিকেও দমন করেছে। সুতরাং প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় ইসলাম আপন অধিকার প্রকাশকে সমর্থন করেন। কেউ যেনো আপন অধিকার এরকম ভাবে চালনা না করে যার দরুন অন্যের শুধু ক্ষতিই করা হয়। মুসলিম ব্যবস্থাপকগণ এবিষয়ে কেমন উদার ভাব দেখিয়ে সহৃদয়তার সংগে বিধান দিয়েছেন। যে ঋণীর সামর্থ নেই, তাকে মিথ্যা হয়রান করবার মতলবে তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করাকে ইসলাম নিষেধ করে দিয়েছে, কারণ তাতে লাভ কোথায়? এই রকম যার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লওয়া দরকার তার শত্রুকে আমমোখতারী দেওয়া অশোভন ও অনুচিত। যে স্বভাবত নিষ্ঠুর তাকে ভারবাহী পশু বিক্রয় করা বা ধার দেওয়া অনুচিত এবং যে লম্পট তার কাছে তরুণী বাঁদী বিক্রয় করা বা তার অধীনে কাজে নিয়োগ করা অন্যায়। কারণ সে এরকম বাঁদীকে পথভ্রষ্ট ও চরিত্রহীনা করে ফেলবে। এই রকম যে তরুণের মনে নারী সংগ-লিপ্সা প্রবল হয়ে উঠেছে, যে পুরুষের এক স্ত্রী থাকা সত্বেও কিংবা অক্ষমা রুগ্না-স্ত্রী থাকার দরুন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা দরকার, অথবা যে বিধবা নারীর পুত্র কন্যা থাকা সত্বেও দৈহিক ক্ষুধা প্রবল, তাদের সকলকেই স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করতে ইসলাম ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য হিসাবে বিধান দিয়েছে। এই রকম ইসলাম সব ক্ষেত্রে নৈতিক নীতির দিকে লক্ষ্য রেখেই মুসলিম সমাজ জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে।

ইসলাম সত্যই শিক্ষা দিয়েছে—"মানুষের এমন কোনো অধিকার নাই যাতে আল্লার অংশ নেই; আল্লার অংশ হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট মানুষকে তার যথাযোগ্য অংশ দেওয়া এবং তার 'হক' বা অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত না করা।" এই হক-হকুকের স্বীকৃতি স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে পৃথক করা হয় নি। বরঞ্চ এখানে একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে ইসলামই দুনিয়ায় সর্বপ্রথমে নারীকে সম্মানজনক মর্যাদা দান করেছে এবং সংসার জীবনে তার স্থান পুরুষের স্বার্থের খাতিরে ক্ষুণ্ন করে নি। সকল মানুষের এই আল্লার দেয়া অধিকারকে স্বীকার করে লওয়া এবং তাকে মেনে চলাই প্রত্যেক সত্যানুরাগী সরল-সঠিক পথানুগ মানব-সমাজের প্রকৃত আদর্শ। ইসলামের এই অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ পাশ্চাত্য জগত গ্রহণ করে বিশেষ ভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনের ক্রম বিকাশে ইসলামের দান কম নয়। ইসলাম জেহাদের সময়ে ও 'সিয়ার' বা যুদ্ধ কালে ও শান্তির সময়ে অন্য দেশের সংগে আদান-প্রদানের বিশিষ্ট নীতি অনুসরণের বিধান করেছে, জিম্মি বা বিজিত জাতির

প্রতি ব্যবহারের আলাদা অনুশাসন দিয়েছে। একথা আজ অনস্বীকার্য যে "পশ্চিমে হিসপানী শেষ পূর্বে সিন্ধু হিন্দু দেশ" পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিনায়ক মুসলমানরাই দুনিয়া সর্বপ্রথমে যুদ্ধ-বিগ্রহে বা শান্তির সময়ে বিদেশ ও ভিন্ন রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের অধিকার সমন্ধে কার্যকরী আইন-কানুনের বিধান দান করে এবং তার দরুন ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্রে আন্তর্জাতিক আইনের স্থান বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়। আধুনিক কালের ইউরোপীয় খ্যাত-নামা আন্তর্জাতিক আইনের লেখক-গোষ্ঠি—Bello, Ayala, Victoria Gentiles—সকলেই স্পেন ও ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের চিন্তাধারার সংগে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য বা ব্যবহার শাস্ত্রের কোনো মিল নেই, অন্য পক্ষে ইসলামের জেহাদ ও সিয়ার নীতির প্রভাব তাঁদের লেখায় সুস্পষ্ট। আজকাল অনেকেরই ধারণা যে ইউরোপ আরবজাতি ও মুসলমানদের কাছ থেকে আইনের এই বিশেষ শাখায় শিক্ষা দান করেছিলো।

আধুনিক সভ্যজগতে সমাজ-নীতি ও ব্যবহার নীতিতে ইসলামের দান সম্পর্কে সঠিক পরিমাণ নির্দেশ করা বড় শক্ত। স্যাণ্টিল্লানা (D. Santillana) যথার্থই বলেছেন আরবী ব্যবহার-শাস্ত্র থেকে আমরা সরাসরি ভাবে গ্রহণ করেছি যৌথ-কারবারের আদর্শ ও তেজারতি সওদাগরী বিষয়ক আইনের মূল-নীতি। কিন্তু এসব ছাড়াও আমাদের আধুনিক সাধারণ আইন ও নীতি সম্পর্কিত মতামত নির্ধারণ করতে উচ্চ নৈতিক-আদর্শ অনুগ আরবী ব্যবহার-নীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে সন্দেহ নেই এবং এইটাই তার সবচেয়ে প্রশংসনীয় স্থায়ী দান।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানরা কার্যকরী ও মৌলিক শিক্ষা দান করে। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অবদান প্রথম শ্রেণীর ছিলো—পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় তারা চরমোন্নতি লাভ করেছিলো। 'মানবতার ক্রম-বিকাশ' নামক বিখ্যাত কিতাবে (অধ্যাপক ব্রিফল্ট (Briffaut's the Making of Humanity) স্বীকার করেছেন যে, আরবী কালচারের কাছেই বিজ্ঞান নিজের অস্তিত্বের জন্য ঋণী।) অধ্যাপক রাজিউদ্দিন বলেন ইসলামের দ্বারাই পাশ্চাত্য জগত আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করেছে। বাস্তবিক আরবী ও মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চার সম্যক আলোচনা আজো সম্ভবপর না হলেও একথা অনস্বীকার্য যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণার স্পৃহা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ধারা ও প্রণালী ইসলামিস্তানের সংস্পর্শে আসার ফলেই খৃষ্টিয় সুধীগণ ইউরোপে আমদানী করেছিলেন।

একথায় সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আরবীরা সিরীয়ার খ্রিস্টানদের নিকট থেকেই সর্বপ্রথমে বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে। নেষ্টোরিয়ানরাই এবিষয়ে আরবীদের প্রধান শিক্ষক ছিলো। সে আমলে জুন্দেশাপুরে নেষ্টোরিয়ানদের একটা সুবিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো। আরবীরা ইসলাম প্রচারের প্রথম দুই শতকের মধ্যে গ্রীক ও সিরীয়াক ভাষায় লিখিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থগুলির আরবীতে তর্জমা করে, পরের দুই শতাব্দী ধরে এ বিষয়ে নানা গবেষণা ও উন্নতি সাধন করে এবং তারপর স্পেন ও সিসিলির ল্যাটিন ভাষাভাষীদিগকে এই শিক্ষা দান করে। এসব কাজে ইহুদীরাও আরবদের প্রধান সহায়ক হয়েছিলো।

(জুন্দেশাপুরের শিক্ষাগার মুসলমানদের প্রথম যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র হিসাবেই ব্যবহৃত হতো।) এখানকারই আরবী নামধারী খ্রিস্টান ও ইহুদী বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকবৃন্দ দামেস্কের ওমাইয়া খলিফাদের দরবারে যেয়ে ভীড়

জমাতেন। মাসির-জাবিহ নামক ইরাণী ইহুদীই সবার আগে Ahron-এর Pandects নামক গ্রন্থখানা আরবীতে তর্জমা করেন। সম্ভবত এখানাই আরবী-ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান পুস্তক। ওমাইয়া খলিফাদের আমলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে আজো ইতিহাস মৌন হয়ে রয়েছে। কেবলমাত্র খলিফাজাদা খালেদ-ইবনে-ওলিদের নামই তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সব লেখার অস্তিত্ব আজ নেই, তাঁর চিন্তাধারার সংগে আজো আমরা মোটামুটি পরিচয় লাভ করতে সক্ষম না হলেও একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনিই মুসলমানদের মধ্যে কিমিয়া বা সোনা তৈরী করার জন্য সর্বপ্রথম গবেষণা করেছিলেন।

আব্বাসী খলিফাদের আমল থেকেই মুসলমানদের বিজ্ঞান-চর্চার স্বর্ণযুগ শুরু হয়। তাঁদের আমলে মুসলমানরা পদার্থ ও রসায়ন-বিদ্যা বিশেষত 'কিমিয়া' (Alchemy) বিষয়ে সবচেয়ে বেশী গবেষণা করে এবং এসব বিষয়ে তাঁদের দান নিঃসন্দেহে তাঁদিগকে অমর করে রেখেছে। দ্বিতীয় আব্বাসী খলিফা অল-মনসুরের সময় থেকে গ্রীক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলি একের পর এক তর্জমা করা শুরু হয়—জুন্দেশাপুরেই একাজ বিশেষভাবে চলতে থাকে। সারা নয় শতক ধরে একাজ অব্যাহতভাবে চলে। খলিফা অল-মামুনের সময় বাগদাদে একটি বৃহৎ তর্জমার কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠিত হয় হুনান-ইবনে-ইসহাক একাজে সকলের সেরা ছিলেন। তাঁর এবং আরো অনেকানেক বৈজ্ঞানিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রীক বিজ্ঞানের সমগ্র দান আরব-জগতে পরিচিত হয়ে উঠে। তবে এখানে একথা বলা দরকার যে, এই তর্জমার কাজ কেবল গ্রীক ভাষায় লেখা গ্রন্থ থেকেই করা হতো না, হিব্রু, সিরীয়াক, ভারতের সংস্কৃত, এমনকি চীনা ভাষায় লেখা গ্রন্থাবলী থেকেও করা হতো। একথা আরো উল্লেখযোগ্য যে, নয় শতকের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিক রচনাদিতে সিরীয়াক ভাষারই প্রাধান্য ছিলো—এই শতকের শেষের দিক থেকেই আরবী-ভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়।

(মৌলিক বিজ্ঞান সাধনায় অল-কিন্দির নাম আরবজগতে সবচেয়ে বিখ্যাত। তিনি কমপক্ষে দুশো পঁয়ষট্টি খানা মৌলিক বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে পনেরো খানা সৌরজগত ও আবহাওয়া সম্পর্কে, কয়েকখানা ভার ও গুরুত্ব, জলস্রোত, আলোকতত্ত্ব ও সংগীত বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখিত হয়েছিলো।) আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অল-কিন্দির বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বহু গ্রন্থই নষ্ট হয়ে গেছে। (তাঁর লেখা থেকে ল্যাটিনকৃত De aspectibus নামক গ্রন্থখানির দ্বারা রোজার বেকন প্রভৃতি খ্যাতনামা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিশেষভাবে উপকৃত হন।)

মেসোপটেমিয়া ও মিসরে সেচ-প্রণালী এবং কাটা-খালের মধ্যদিয়ে জলপথের বিশেষ উন্নতি বিধান করা হয়। এসব কাজের দরুন অর্থকরী জ্ঞানের দিকও প্রসারিত হয়। নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয় এবং অর্থকরী জ্ঞান-

বিষয়ক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে স্রোত-নিয়ন্ত্রণ, উঁচু-নিচু প্রকার ভেদের উপকারিতা, জল পরিমাপক ও জলঘড়ি যন্ত্রাদি নির্মাণ বিষয়ে গ্রন্থাদি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মোহাম্মদ, আহমদ ও হাসান নামে তিন ভাই ৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বহুবিধ অর্থকরী যন্ত্রপাতি বিষয়ক একখানা কিতাব রচনা করেন। সেখানায় প্রায় একশো রকম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কৌশল ও প্রণালী দেওয়া আছে।

আট শতকে প্রাকৃতিক বিন্যাস ও ইতিহাস সম্পর্কে আরবী বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই দিকে তাঁরা প্রধানত তিনটি বিষয়ে গবেষণা করেন—প্রাণিজগত, উদ্ভিজ্জগত ও প্রস্তরজগত। এসব বিষয়ে সবচেয়ে নামকরা লেখক ছিলেন বসরার বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক অল-আস-মাই (৭৪০-৮২৮ খ্রি.)। ঘোড়া, উট, বন্যজন্তু গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা ও মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধে তিনি পৃথক পৃথক পুস্তক রচনা করেছিলেন। ইবনে-ওয়াশীয়া প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহের বিশেষ বিবরণ, তাদের চাষ ও পালন সম্বন্ধে মৌলিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে বাবিলন ও সেমিটিকদের মধ্যে এসব বিষয়ে প্রচলিত বহু কাহিনীও লিপিবদ্ধ করা আছে। পশুপালন সম্বন্ধে ক্যাসিনাস বাসাস (Cassianus Bassus, আনুমানিক ৫৫৩ খ্রি.) লিখিত কিতাবখানা বিভিন্ন লেখক কর্তৃক আরবীতে তর্জমা করা হয়। এরিষ্টটলের খনিজ পদার্থ-বিষয়ক গ্রন্থটি আরবীতে তর্জমা করা হলে আরবী বৈজ্ঞানিকগণ প্রস্তর, বিশেষত মূল্যবান প্রস্তারাদি সম্পর্কে গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লিখতে আরম্ভ করেন। অলকিন্দি লোহা ও ইস্পাত নির্মিত হাতিয়ার সম্বন্ধে কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। (আধুনিক বহু প্রস্তরের নামে মুসলমানী প্রভাবের অস্তিত্ব দেখা যায়—বেজোয়ার (Bezoar) নামটি ফারসী 'পাদ-জহর' (বিষঘ্ন) শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রকম গ্রীকদের অজ্ঞাত বহু গাছ ও ভেষজ-গাছড়ায় আরবী ও ফারসী নামের উল্লেখ দেখা যায়, যেমন Camphar, Kalanga-root, musa, embr প্রভৃতি। ৭০২ খ্রিস্টাব্দে ইউসফ-ইবনে ওমার প্রথম তুলার কাগজ প্রস্তুত করেন এবং ৭০৪ সালে বাগদাদে একটি কাগজ তৈরীর কারখানাও স্থাপিত হয়। আধুনিক অনেক লেখকের ধারণা যে কাগজ সর্বপ্রথম প্রস্তুত ও তার ব্যবহার শুরু হয় চীনাদের দ্বারায়। কিন্তু মুসলমানরা যে তাদের কাছ থেকে এই বিদ্যাটি সরাসরি গ্রহণ করেছিলো তারও কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ একথাটি সকলেই স্বীকার করেন যে ইউরোপ মুসলমানদের কাছ থেকেই সর্বপ্রথম কাগজের ব্যবহার ও কাগজ তৈরীর প্রণালী শিক্ষা করেছিলো।)

রসায়ন-বিদ্যায় আবু মুসা জাবীর ইবনে-হাইয়ানের নাম বিশ্ববিখ্যাত। তিনি Gebar নামে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের নিকট সুপরিচিত। রসায়নকে তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে বর্ণনা করেছেন—তাঁর মতে রসায়নের কাজ হচ্ছে খনিজ-পদার্থের উৎপত্তি ও গুণাগুণ এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের সার বস্তু

পর্যবেক্ষণ করা। তাঁর মতানুসারে সাধারণ চলতি কথা ও ধারণা মেনে নেওয়া এবং তারই অনুসরণ করা রসায়নের কাজ নয়। তিনি প্রথম শিক্ষা দেন যে আমাদের এরকম ধ্রুব ও কঠোর নীতি হওয়া উচিত যে যে-প্রতিজ্ঞা বা দাবী প্রত্যক্ষ নজীরের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয় তার উপর আস্থা স্থাপন করা চলে না, কারণ সেটা সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। যখনই কেউ তার দাবীর সমর্থনে বাস্তব প্রমাণ ও নজীর দেখাতে পারবে, তখনই তার দাবীকে আমরা সত্য হিসাবে গ্রহণ করবো। বিজ্ঞান-চর্চার এই প্রাথমিক স্বচ্ছ-জ্ঞান থেকেই আরবী বৈজ্ঞানিকদের বাস্তব ও পরিষ্কার দৃষ্টিভংগির পরিচয় মেলে। ধাতুর গুণাগুণ সম্পর্কে জাবীরের মতামত নিঃসন্দেহে গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে উন্নত ছিলো—একথা প্রত্যেক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। এক কথায় ধাতুর সম্পর্কে তাঁর মৌলিক মতামত আঠারো শতক পর্যন্ত ইউরোপে রসায়নশিক্ষায় বিনা দ্বিধায় গৃহীত হতো। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার কাজে জাবীরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিলো। ইস্পাত তৈরী, ধাতুর শোধন, তরল ও বাষ্পীকরণ প্রণালী, বস্ত্র ও চর্ম রঞ্জন, জলরোধক বস্ত্রের জন্য ও লোহার উপর মরিচা-রোধক বার্নিশ, চুলের নানা রকম কলপ, প্রভৃতি অনেক-অনেক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী ও বিধি সম্বন্ধে তিনি তাঁর রচনাবলীতে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। হস্তলিপির জন্য চিরস্থায়ী ও উজ্জল রঙের কালি প্রস্তুতের প্রণালীও তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। এই কালি মূল্যবান সোনা থেকে প্রস্তুত না করে সোনালী মারকাসাইট (marcasite) থেকে তৈরী হতো। তিনি manganese dioxide থেকে কাচ তৈরী করতেও জানতেন। সিরকা (vinegar) পাতনপূর্বক সিরকা-প্রধান অম্ল (acetic acid) তৈরী করতেও তিনি পারতেন এবং সাইট্রিক এসিড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংগেও তাঁর পরিচয় ছিলো।

আরবী 'কিমিয়ার' জন্মদাতা হিসাবে জাবীরের নাম বিশ্ববিখ্যাত। এই কিমিয়ার কামিয়াবী হাসিল করতে আরবী বৈজ্ঞানিকদের উদ্যম অসাধারণ ছিলো এবং প্রত্যেক বিখ্যাত আরবী বৈজ্ঞানিকই এ-বিষয়ে যথেষ্ট মগজ ও কালিকলম খরচ করেছিলেন। কিমিয়া শব্দটি মূলত মিসর দেশীয় 'কাম-ইত' বা 'কেম-ইত' শব্দ অথবা গ্রীক 'কাইমা' বা গলিত ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। গ্রীক ও মিসর দেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ এবিষয়ে এই মত পোষণ করতেন (১) সব ধাতুই আসলে এক, অতএব এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তন করা সম্ভব; (২) সোনা-ই সব ধাতুর মধ্যে খাঁটি, তারপরে রূপার স্থান; (৩) এমন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া থাকা সম্ভব, যার ফলে নীচুস্তরের ধাতু থেকে খাঁটি ধাতু প্রস্তুত করা যেতে পারে। কিমিয়া-গিরির সাধনায় এই ধারণাই সবচেয়ে বেশী প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাতো। কিমিয়া সম্পর্কে জাবীরের প্রায় একশত পুস্তকের

আজো অস্তিত্ব মেলে। তাদের অনেকগুলি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে অন্য সকল বিজ্ঞান-সাধকের চেয়ে জাবীরের পর্যবেক্ষণ জ্ঞান তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ ছিলো। তার দরুন রাসায়নিক চিন্তাধারায় ও হাতে-কলমের কাজে তিনি বেশ অগ্রগামী হতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইউরোপীয় রাসায়নিক জ্ঞান ও আলকেমীর চিন্তাধারায় তাঁর প্রভাব প্রায় সব স্তরেই নজরে পড়ে। চৌদ্দ শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলি ইউরোপ ও এশিয়ার বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলো। জাবীরের আরবী লেখা থেকে বহু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ল্যাটিন ভাষার মারফত ইউরোপীয় ভাষা সমূহে প্রবেশলাভ করেছে, যেমন বিয়ালগার (red sulphide of arsemic) আরবী 'বাহয-উল-গর' থেকে, তুতিয়া (zinc oxide), অ্যালক্যালি আরবী 'আল-কহল' থেকে, এণ্টিমণি আরবী ইসমিদ থেকে। পাতন (distillation) যন্ত্রের উপর দিকের নাম আলেম্বিক ও নীচের দিকের নাম এ্যালুডেলও আরবী ভাষা থেকে নেওয়া।

মুসলিম বিজ্ঞান-চর্চার স্বর্ণ যুগে (নয় থেকে এগারো শতক) শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন তেহরানের রায় অঞ্চলের অধিবাসী অল-রাজী। ইউরোপে তিনি Razes নামে সুপরিচিত। ধর্মতত্ব, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর অসাধারণ দখল ছিলো। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চায় তিনি পদার্থ, স্থান, কাল, গতি, প্রাণীর পরিপাকশক্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়, খনিজতত্ব, আলকেমী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছিলেন। আলকেমীতে তাঁর গবেষণার বিষয় অতি অল্পদিনই হলো আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত কিতাবটি কয়েকবছর আগে ভারতীয় এক নওয়াবের কুতুবখানা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। একই উৎস থেকে জ্ঞানলাভ করলেও অল-রাজীর বস্তু-বিভাগ প্রণালী এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কীয় বর্ণনা জাবীরের চেয়ে উন্নত ধরনের ও মিষ্টিক প্রভাব মুক্ত ছিলো। জাবীর ও তাঁর অনুসারী আরবী বৈজ্ঞানিকগণ খনিজ বস্তুসমূহকে দেহ (যেমন সোনা, রূপা প্রভৃতি), প্রাণ (গন্ধক, আর্সেনিক ইত্যাদি) ও আত্মা বা স্পিরিট (যেমন পারদ, sal-ammoniac) এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন। কিন্তু অল-রাজী আলকেমীর বস্তু-সমূহকে বিভাগ করেছিলেন উদ্ভিদ, প্রাণী ও খনিজ পর্যায়ে এবং তাঁর অনুসৃত প্রণালীটিই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মহলে গৃহীত হয়েছে। খনিজ বস্তুকে তিনি তরল ও নিরেট দ্রব্য, প্রস্তর, গন্ধক (vitriols), সোহাগা ও লবণে বিভাগ করেছেন এবং উদ্বায়ী-বস্তু ও অনুদ্বায়ী স্পিরিটে পার্থক্য দেখিয়ে শেষোক্ত পর্যায়ে তিনি গন্ধক, পারদ, আর্সেনিক ও সালমিয়াককে স্থান দিয়েছেন। তিনি নানারকম সুরাসার (alcoholic fluids) প্রস্তুত করবার প্রণালীও জানতেন। হারিকস শোধন করে তিনি ঘনীভূত গন্ধক দ্রব্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাছাড়া তিনি কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী করার প্রণালী উদ্ভাবন করে সমসাময়িক

যুগকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ইউরোপ পানি থেকে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী করার প্রণালী ষোলো শতকের গোড়ার দিকেও অজ্ঞাত ছিলো।

দশ ও এগারো শতকে তিনজন বিখ্যাত মুসলিম বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেন। বসরার হাসান-ইবনে-হাযম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.) ইউরোপে Alhazen নামে সুপরিচিত। তিনি বায়ু ও পানির মতো স্বচ্ছ ও তরল পদার্থের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিশক্তির ও প্রতিফলিত আলোকের বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। কাচের গ্লাসে পানি রেখে গবেষণার দ্বারা তিনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীর দ্বারা কেপলার (Joham keplar) ও লিওনার্ডো (Leonardo da Vinei) অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। রোজার বেকন তাঁরই লেখার উপর নির্ভর করে দৃষ্টিশক্তির বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। ইবনে-সিনা খনিজ-বস্তু, পাথর ও পাহাড়ের জন্ম ও দানা-বাঁধা সম্পর্কে একখানা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানা ভূবিদ্যার ঐতিহাসিক আলোচনা, ঝড়, পানি, আবহাওয়া, ভূমিকম্প, তলানি এবং তরল পদার্থ ঘনীভূত ও কঠিন হওয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ ও মূল্যবান। আবু রায়হান মোহাম্মদ অল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.) একাধারে ইতিহাস, ভাষাতত্ব ভূগোল,গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন, তার দরুন তাঁকে 'ওস্তাদ' বলা হতো। তাঁর প্রাচীন জাতিসমূহের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ইউরোপে বহু ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে। পদার্থ-বিদ্যায় তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান হচ্ছে আঠারোটি ধাতু ও মূল্যবান প্রস্তরের বিশেষ ওজন নিরূপন ও নির্ধারণ করা। তিনি প্রকৃতি, তেজারতী ও চিকিৎসার দিক দিয়ে ধাতু ও প্রস্তরের গুণাগুণ ও বিশেষ উপকারিতা সমন্ধেও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। ইসলামের স্বর্ণযুগের তিনি একজন নিঃসন্দেহে অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ও সর্বজনমান্য সুধী ছিলেন।

দশম শতকের 'ইখওয়ানুস-সাফা' জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় অশেষ কীর্তি রেখে গেছেন। এই শুদ্ধাচারী ও জ্ঞানী ভ্রাতৃসঙ্ঘ প্রায় বায়ান্নটি মৌলিক রচনা প্রকাশ করেন, তার মধ্যে সতেরটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধেই লেখা হয়েছিলো। বাগদাদের গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় যদিও তাঁদের বহু লেখা 'বেদাত' হিসাবে পুড়িয়ে ফেলেছিলো, তবু একথা অনস্বীকার্য যে তাঁদের চিন্তাধারা ও মনন শক্তি আন্দালুস পর্যন্ত দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনায় অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। জলঘড়ি নির্মাণে তাঁদের বিশিষ্ট প্রণালী ইসলামজগতে আদৃত হয় এবং তারই অনুসরণ করে মুসলমানরা এই যন্ত্রটির নির্মাণ-কৌশলে বিশেষ চাতুর্য দেখায়। খলিফা হারুন-অল-রশীদ একবার দূতসহ এই বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত জলঘড়ি ফ্রান্সের সম্রাট—শার্লমেনকে সওগাত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।

জলঘড়ি ও পানি মাপ করার যন্ত্র উদ্ভাবনায় মুসলমান বৈজ্ঞানিকদের দান বাস্তবিকই অতুলনীয়। পানি, পারদ ও জ্বলন্ত বাতির দ্বারা জলস্রোতের এবং সময়ের পরিমাপ করা হতো। প্রত্যেক শহরে ও প্রধান প্রধান স্থানে সরকারী তত্ত্বাবধানে এই রকম স্রোত ও সময় পরিমাপক যন্ত্র বসানো হতো। তাছাড়া অসংখ্য সাধারণ নাগরিকের ঘরে এসব যন্ত্রের ব্যবহার ছিলো। অল-জাযরী ১২০৬ সালে এসব যন্ত্রপাতি ও ঘড়ি সম্বন্ধে একটি মূল্যবান ও বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন, আজো সেটির অস্তিত্ব আছে।

ইউরোপে রেনেসাঁর যুগের পূর্বে মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণই বিজ্ঞানশাস্ত্রের সকলদিকে আলোক বিতরণ করেছিলেন। গ্রীক-বিজ্ঞানের সবকিছুই তাঁরা অসীম অনুসন্ধিৎসা নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রীকদের চিন্তাধারা যেখানে অস্পষ্ট, ঘোলাটে ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, সেখানে তাঁরা নতুন আলোক দান করে মানবের কল্যাণ ও মংগলকর নয়া নয়া বিষয়ের উদ্ভাবণ ও সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরাই ছিলেন ইউরোপের গাঢ় অন্ধকার যুগের (Dark Ages) আসল আলোকবর্তিকাধারী—তাঁদের শিক্ষায় ও সাধনায় ইউরোপ নতুন জীবনের আস্বাদন পায় এবং বিজ্ঞানের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যেই মানুষের সর্বাংগীন উন্নতি ও কল্যাণ নিহিত আছে, এ শিক্ষাও তাঁদের পদমূলে সর্বপ্রথম লাভ করে। ইউরোপের বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির মূলে আছে এসব আরবী ও ইসলামী বৈজ্ঞানিকদের প্রত্যক্ষ দান এবং এপথে আজো তাঁদের পদধ্বনি মুহুর্মুহু শোনা যায়।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা

গণনা ও হিসাবের কাজে সাহায্যের জন্যই গণিতের সৃষ্টি। দুনিয়ার প্রত্যেক জাতির মধ্যে গণনার ও হিসাব রাখার কাজ আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। যে জাতির বিস্তৃতি ও রাজ্যের সীমানা যতোই বৃদ্ধি পেয়েছে, ততোই তার রাজকীয় আয়ব্যয়ের খতিয়ান রাখার জন্য হিসাবের কাজ দরকারী বিষয় হয়ে উঠেছে। এই রকম তেজারতী প্রসারের সংগে সংগেও হিসাবের কাজ অতি দরকারী হয়ে পড়েছে। এসব দরকারী কাজ সহজ ও সুবিধা জনকভাবে করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জাতির উর্বর-মস্তিষ্ক ব্যক্তিরা গণনার ধারা বিভিন্ন নিয়মে ও বিবিধ ছাঁচে গড়ে তুলেছেন। এভাবে কালক্রমে উন্নত ধরনের নিয়ম ও পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে গণিত-বিদ্যাই উৎকৃষ্টভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের ফলে একজাতি অন্য জাতির সংগে গণনার নিয়ম ও পদ্ধতি বিনিময় না করে পারে না। তাতে একজাতির মনিষীর সাধনা সহজভাবেই অন্য জাতির মধ্যে আদর লাভ করে থাকে। ইসলাম বিস্তৃতির সংগে সংগে মুসলিম রাষ্ট্র চারিদিকে বিদ্যুৎ-গতিতে প্রসারিত হয়ে উঠে এবং তার ফলে আরবীরা প্রাচ্যে ইরাণিও হিন্দুস্তানবাসীর সংগে পরিচিত হয়ে উঠে। এই পরিচয়ের সূত্র ধরে পারস্পরিক শিক্ষা ও জ্ঞানভাণ্ডারের বিনিময় হয়ে পড়ে। এভাবে গণিত-বিদ্যারও বিনিময় হয়নি, একথা বলা চলে না। তবে এই বিনিময়ের ফলে গণিত-শাখার মধ্যে কোনটি কোন জাতির নিজস্ব এবং কোনটি কিভাবে কোন জাতির হাতে বিকাশলাভ করেছে তা নির্ণয় করা শক্ত ব্যাপার।

আরব জাতিটা সব সময়ে বাস্তববাদী, অলীক কল্পনার সংগে তাদের সংস্রব বড়ো কম। হিন্দুদের গণনা শাস্ত্রে 'কল্প' 'যোগ; 'ব্রহ্মকাল' প্রভৃতি মানুষের ধারণাতীত কালের যেরকম বর্ণনা আছে আরবীরা তার ধার ধারে না। গ্রীকদের মতো অসম্ভব রকম বড়ো বড়ো রাশির সংগেও তাদের পরিচয় কম। তারা

মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির ধারণাক্ষম রাশি নিয়েই কারবার করে। তার দরুন তাদের গাণিতিক নিয়ম, সংজ্ঞা ও আলোচনা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

আরবীতে অংকবিদ্যাকে 'সানা' আতুল হিসাব' বলে। যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, ভগ্নাংশ, দশমিক প্রভৃতি অংকবিদ্যার সীমানায় পড়ে। অল-আরতামাতেকী' কেতাবে সংখ্যাগুলির গুণের বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরাজী 'এরিথমেটিক' (arithmatic) বা গণিত বিদ্যা অল-আরতামাতেকী শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা বিবেচনার বিষয়। আরবী সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলি তাদের নিজস্ব কিনা এসমন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা আছে। বিখ্যাত গণিতবিদ অল-খারেজিমীর সুপরিচিত গণিত পুস্তকখানাই (de numero indico) সংখ্যাগুলির উৎপত্তি-সম্পর্কে বহু-বিতর্কিত প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। ইংরাজীতে যেসব সংখ্যাবাচক চিহ্নকে (যেমন 1, 2, 3, ইত্যাদি) আরবী চিহ্ন বলে, আরবীরা আবার সেগুলিকে হিন্দি চিহ্ন বলে এবং এভাবেই তারা আরবী বর্ণমালার অক্ষরের সাহায্যে গণনাকে (যেমন আলিফ, বে, জিম, দ্বাল, ইত্যাদি) পৃথক হিসাবে দেখে। এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন রোমকরাও তাদের বর্ণমালার অক্ষরের সাহায্যেই গণনাকার্য চালাতো (যেমন I = ১, V = ৫, X = ১০, L = ৫০, ইত্যাদি) এবং তার দরুন বর্তমান ইউরোপে সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলি আরবী (যেমন 1, 2, 3, 4, 5 ইত্যাদি) ও রোমান (যেমন I, V, X, L ইত্যাদি) দুইরকম টাইপে প্রচলিত আছে। যা হোক,আরবীরা সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলিকে হিন্দি নামে পৃথকভাবে দেখে বলে একথা অনেকেই অনুমান করেন যে তারা এগুলিকে তাদের নিজস্ব আবিষ্কার হিসাবে দাবী জানায় না। কিন্তু এথেকেই সেগুলি ভারতীয় আমদানী বলে গ্রহণ করা সমীচীন হবে না, কারণ আরবী 'হিন্দি' ও 'হিন্দাসী' কথা দু'টির মধ্যে সহজেই গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হিন্দাসী শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্যামিতিক বা যন্ত্রবিদ্যা সমন্ধীয়। বহুক্ষেত্রে আরবীতে 'হিন্দাসী' শব্দের স্থলে 'হিন্দি' শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। জ্যোতির্বিদ্যার একটি চক্রকে হিন্দি বলে, তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে গাণিতিক চক্র; অতএব সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলিকে 'হিন্দি' বললে গাণিতিক অক্ষরও বুঝায়। দশম শতকে ওস্তাদ অল-বেরুনী বলেছেন যে আরবী-সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলি ভারতীয় সুন্দর ছাঁচ থেকে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি কোথাও দেখান নি, ভারতীয় ছাঁচগুলি কোন ধরনের ছিলো এবং ভারতের কোন কোন অঞ্চলে তাদের চলন ছিলো। অন্যপক্ষে আরবী অংকচিহ্নগুলি বড়ো সহজ ধাঁচের ও অনায়াসে লেখা যায়। এগুলি মৌলিক না হলে এভাবে লেখা সহজ নয়। আরবীদের শূন্য-চিহ্ন (zero) একটি ছোট্ট বৃত্তের বা বিন্দুর মতো। এটি রাশি লেখবার পক্ষে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার। শূন্য-চিহ্ন না থাকলে আমাদিগকে একক, দশক, শতক প্রভৃতির

'রাশির টেবিল' সাহায্যেই কাজ চালাতে হতো—তাকে চলতি কথায় হিসাবের টেবিল (abacus) বলে। আরবীরা ইউরোপবাসীদের অন্তত আড়াইশো বছর আগে থেকে শূন্য-চিহ্নের ব্যবহার জানতো। প্রায় বারো শতকে খ্রিস্ট গণিতজ্ঞেরা শূন্য-চিহ্নের সাহায্যে গণনা করতে শুরু করে। তার পূর্বে দশ-শতকের আরবী গ্রন্থকার 'মিফতাহ-অল-উলুমে' (জ্ঞানের চাবিকাঠি) গণনার সুবিধার জন্য সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলির সংগে একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত যোগ করবার যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই অতি ক্ষুদ্র বৃত্তকে 'সিফর' বলা হয়। ল্যাটিন 'সাইফার' (cipher) শব্দে কখনো শূন্য, কখনো বা '1' থেকে '9' পর্যন্ত অংকগুলি বুঝায়। অতএব যখন ল্যাটিন 'সাইফার' শব্দে শূন্য বুঝায়, তখন আরবী 'সিফর' শব্দেরই প্রতিধ্বনি করে। এই অর্থটি খাঁটি আরবী শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে।

'খোলাসাতুল-হিসাব' নামক গণিত পুস্তকের আলোচনার বিষয়বস্তু থেকে স্বতঃই ধারণা হবে, আরবদের গণিতবিদ্যা কতোখানি উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলো। এই কিতাবে অমিশ্র-অংক, মিশ্র-অংক, ত্রৈরাশিক, দুই ভুলের (খাতাহ্) দ্বারা অংকের ফল নির্ণয় করা, অংক-কষার সহজ প্রণালী, জরীপ, নহর ও কূপখনন ও পরিমাপক, নদীর প্রশস্ততা, পাহাড়ের উচ্চতা নিরূপণ করার প্রণালী, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। পূরণ (multiplication) না করে শুধু ফল লিখে দেওয়ার আশ্চর্য প্রণালীও আরবীদের আবিষ্কার। দুই ভুলের দ্বারা অংকের ফল নির্ণয় করার (Regula Duarum falsarum) প্রণালী ইউরোপে সতেরো ও আঠারো শতক পর্যন্ত আরবীদের নীতির অনুসারী ছিলো। আরবী 'অল-মোয়ামিলাত' অনেকটা শুভংকরীর আর্যার মতো। সহজে মনে রাখা যায় এভাবে গণিতের বিষয়গুলি অজস্র দৃষ্টান্তসহ একত্রে লিখিত হয়েছে। মুয়ামিলাতুজ-জাহারাবী, মুয়ামিলাতে ইবনে-সাম্‌হ্ ও মুয়ামিলাতে-আবি-মুসলিম এবিষয়ের আদর্শ পুস্তক।

মুসলিমরাই খ্রিস্টজগতে বীজগণিতের (Algebra) প্রথম শিক্ষাদাতা। আরবী বীজগণিতের জন্মদাতা কে সে-বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা রয়েছে। ইবনে-খলদুনের মতানুসারে মোহাম্মদ ইবনে-মুসা-খরজিমী সর্বপ্রথম বীজগণিত আবিষ্কার করেন। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী বীজগণিতজ্ঞ ছিলেন এবং মধ্যযুগে গণিতবিদ্যায় তিনিই সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর হিসাব-অল-জবর-ওআল-মুকাবিলাহ নামক কেতাবটি আরবী বীজগণিত হিসাবে শ্রেষ্ঠ অবদান। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এখানার আরবী-সংস্করণ আর মেলে না। অনেকের বিশ্বাস যে খারজিমীর হিসাব-অল-জবর কিতাব থেকেই ইউরোপীয় আলজেব্রা (Algebra) শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর পদবী 'খারজিমী' শব্দটাই ল্যাটিন-লেখকরা অপভ্রংশ করে algorism ও algorithm শব্দ আমদানী করেছিলেন। প্রসংগক্রমে

এখানে বলা যেতে পারে যে sur বা করণী শব্দ আরবী 'জযর-অসম' শব্দ থেকে নেওয়া। খারজিমীর বীজগণিত প্রাঞ্জল ও সবল ভংগিতে লেখা, তাতে আট শতেরও উপর বিভিন্নরকম উদাহরণ দেওয়া আছে। তিনি একীকরণ (integration) ও দুইডিগ্রির সমীকরণ (equation) সম্পর্কে আলোচনা করে পূরণ ও হরণ সম্বন্ধেও বর্ণনা করেছেন। তিনি সমীকরণকে 'সলব' (solve) করার প্রায় ছয়টি নিয়ম আবিষ্কার করেন। কিন্তু ওমার খৈয়ামের মতো উর্বর মস্তিষ্ক লোকের সাধনায় তা কুড়িটি-সংখ্যায় দাঁড়ায়। খারজিমীর হিসাব-অল-জবর বারো শতকে জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর তর্জমাখানাই ষোলো শতক পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বীজগণিত বিষয়ে সবচেয়ে প্রধান ও প্রমাণযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। অবশ্য ওমার খৈয়ামের বীজগণিতখানা খারজিমীর চেয়ে আরো উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত হয়। খারজিমী দ্বিশক্তি সমীকরণ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু খৈয়াম ঘন-সমীকরণ (cubic Equation) সম্বন্ধেই সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন। তিনি তিন ডিগ্রির সমীকরণকে সাতাশ রকমে অনুশীলন করে চারিটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন। ইউরোপে রেনেসাঁ যুগের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর তিন ডিগ্রির সমীকরণ খ্রিস্টজগতে অপরিজ্ঞাত ছিলো।

কারা ডি ভক্স (Carra de Vaux) বলেন, "আরবীরা প্রধানত জ্যামিতিকার ছিলো। জ্যামিতি ব্যতিরেকে বীজগণিতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা তারা ভাবতেই পারতো না"। আরবীতে জ্যামিতিবিদ্যাকে 'ইলমে-হিন্দাসা' বলে। আব্বাসীবংশের দ্বিতীয় খলিফা অল-মনসুরের সময়ে আরবীরা গ্রীক জ্যামিতি পুস্তক আরবীতে তর্জমা করতে শুরু করে। খলিফা অল-মামুনের আমলে এই অনুবাদ কার্য দ্রুত ও ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। হাজ্জাজ-ইবনে-ইউসুফ ইউক্লিড (Euclid) ও আল-মাগেষ্ট (Almagest) লিখিত শ্রেষ্ঠ গ্রীক জ্যামিতি পুস্তকগুলির তর্জমা করেন। হাজ্জাজ ইউক্লিডের মাত্র ছয়টি খণ্ড অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর বহু পরে নাসিরুদ্দীন তুসী (মৃত্যু ১২৭৪ খ্রি.) 'তাহরিরে-উকলিদস' নাম দিয়ে সমগ্র ইউক্লিডের তর্জমা করেন এবং বহু মূল্যবান টিকা-টিপ্পনী সংযুক্ত করেন। তাঁর অনুদিত তাহরিরে উকলিদসে ষোলটি (কারো কারো মতে পনেরটি) খণ্ড আছে ও সর্বসমেত চারশো আটষট্টিটি প্রতিজ্ঞা (Proposition) আছে। তুসীর লিখিত টিকা-টিপ্পনী আধুনিক জ্যামিতিকারদের পথপ্রদর্শক এবং সে-সব থেকেই আজকালকার বহু উদাহরণ গৃহীত হয়েছে। তুসী নিজে চতুর্ভুজ সম্পর্কে একখানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এখানা চক্র-ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর বই। সামতলিক ও মাণ্ডলিক ত্রিকোণমিতি তুসীর হাতে অতঃপর সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে রূপায়িত হয়ে উঠে এবং তিনিই সর্বপ্রথমে যথারীতি সুশৃঙ্খলার সংগে এই বিষয়টির আলোচনা করেন। ত্রিভুজবিদ্যাকে আরবীতে 'ইলমে-মুসাল্লাস' বলে। সমকোণ ত্রিভুজের যে-কোনো

দু'টি বাহুর পরিমাণ জানা থাকলে অপর বাহুর পরিমাণ জ্যামিতির দ্বারা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু ত্রিভুজের কোনও বাহুর পরিমাণ জানা থাকলেই অজ্ঞাত কোণ বা বাহুর পরিমাণ নির্ণয় করা জ্যামিতির দ্বারা সম্ভব নয়, তা ত্রিকোণমিতির সাহায্যেই করা হয়ে থাকে। আজকাল লগারিথম-টেবলের কিতাব দেখে প্রথমে লগারিথম ঠিক করে পরে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে আঁক কষার নিয়ম প্রচলিত আছে—নাসিরুদ্দীন তুসীই এই অভিনব প্রণালীর জন্মদাতা এবং আজো তাঁর প্রণালী চলে আসছে। ত্রিকোণমিতিতে প্রচলিত Sine (ল্যাটিন Sinus) শব্দটি আরবী 'জেব' (পকেট বা থলি) শব্দেরই তর্জমা মাত্র। ইংরাজ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত রবার্ট (Robert of Cestar) বারো শতকে আরবী 'জেব' শব্দের তর্জমা হিসাবে Sinus শব্দ পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতিতে প্রথমে ব্যবহার করেছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধার্থে আজকাল বিদ্যালয়গুলিতে সংক্ষিপ্ত-জ্যামিতি পড়ানো হয়। এ-প্রণালীটিও মুসলমানরা প্রথমে অনুসরণ করে এবং 'মুখতাসার-ই-উকলিদস' ছাত্রদিগকে প্রথমে শেখাবার জন্য নতুন ছাঁচে রচনা করে। ইবনে-সালাত লিখিত কিতাবুল-ইকতেসার এ-হিসাবে বহু আদরণীয় পুস্তক ছিলো।

'অল-আশকালুল-কুররিয়া' হচ্ছে বৃত্ত সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞার বিশেষ গ্রন্থ। খগোল (Astronomy) সম্পর্কীয় নানা কাল্পনিক বৃত্ত ও তাদের ব্যবহারের বিবরণ এই কিতাবে বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। হস্তশিল্পীদের সুবিধার্থে 'অল-আশকালুল-মখরুতাত' কিতাব লেখা হয়। তাতে বাড়ী ঘর নির্মাণ, সূত্রধরের কাজ, মূর্তিগঠন, ভারবস্তু একস্থান থেকে অন্যস্থানে লওয়ার কৌশল ও নানারকম যান্ত্রিক কাজের অপরিহার্য জ্যামিতিক চিত্র ও কৌশল সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা থাকতো। বনি-শাকের লিখিত 'অল-হিয়ালুল-আমালিয়া' এ-বিষয়ের নামকরা পুস্তক ছিলো। মুসলমানরা জরীপ করার কাজেও কম ওস্তাদ ছিলো না। জরীপের কাজকে আরবীতে 'ইলমে-সাহাত' বলে। তাতে জরীপ করার কাজ, নহর কাটার কাজ, জমির উঁচু-নীচু নিরূপণের প্রণালী ও ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সমতার তারতম্য প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বীজগণিতের সাহায্য না নিয়েও সবরকম ত্রিভুজের সহজে দৈর্ঘ নিরূপণের প্রণালী জরীপের কাজে বড়ো সহায়ক ছিলো। মুসলমানরা এ-সম্পর্কে নানা পুস্তক রচনা করেছিলো।

মুসলমানরা খগোল-বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যায় আশ্চর্য ব্যুৎপত্তি লাভ করে। এ-বিষয়ে ধর্ম তাদের অনুসন্ধিৎসার পরিপন্থী হয় নি, বরং কোরআনের এই বিশেষ শিক্ষাই তাদিগকে এ পথের আরো উৎসাহী অনুসারী করেছিলো সূর্য আপন নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরছে—এটা মহিমময় মহাজ্ঞানী আল্লারই নির্দেশ এবং চন্দ্র খেজুর গাছের পুরানো শাখার মতো না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যও নির্দিষ্ট কক্ষ দেওয়া হলো; চাঁদকে ধরে ফেলা সূর্যের ক্ষমতার (এলাকার) বাইরে; রাতও দিনের আগে

যায় না—সবাই মহাশূন্যে আপন আপন কক্ষে ঘুরছে (সুরা ৩৬ আয়াত ৩৮-৪০)। কোরআনের এই আয়াতটি মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যার মূলধন বললে অত্যুক্তি হয় না। কোরআনের শিক্ষার পূর্বে লোকের ধারণাই ছিলো না যে সূর্য আপন অক্ষরেখার চারদিকে অনবরত ঘুরছে।

জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়ে আরবীরা ভারতীয় বিখ্যাত কিতাব 'সিদ্ধান্তের' (সিন্ধ-হিন্দ) আরবী তর্জমার সংগে খুব গোড়া থেকেই পরিচিত হয়। ইরানী গণনার রাশিচক্রও (জিক) তাদের দ্বারা অনূদিত হয় (জিজ)। তারপর গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার সংগে আরবী তর্জমার মারফতে তাদের পরিচয় ঘটে বেশ নিবিড়ভাবে। হাজ্জাজ-ইবনে-মাসর (৮২৭-৮ খ্রি.) ও হুনাইন-ইবনে-ইসহাক টলেমির বিখ্যাত কিতাব 'আলমাগেষ্ট' (Almagest) তর্জমা করেন। নবম শতকের গোড়ার দিকে জুন্দেশাপুরে বেশ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রথম মানমন্দির (Observatory) স্থাপিত হয়। খলিফা অল-মামুন তাঁর বায়তুল-হিকমাহ বা জ্ঞান-মন্দিরের মতো বাগদাদের শামশিয়া দরওয়াজার পাশে একটা মানমন্দির স্থাপন করেন (৮৩০-৮৩১ খ্রি.)। নও-মুসলিম ইহুদী সিন্দ-ইবনে-আলী ও ইয়াহয়া-ইবনে-মনসুর এইটির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এখানে খলিফার জ্যোতির্বেত্তাগণ গ্রহ-মণ্ডলীর গতি ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেই ক্ষান্ত হতেন না, তাঁরা টলেমির 'আলমাগাষ্টে' বর্ণিত প্রধান প্রধান বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধেও যাচাই করতেন—সৌর অয়ন-বৃত্তের তির্যক গতি, বিষুবরেখা ও অয়নমণ্ডলের সংযোগ স্থানের পূর্ববর্তিতা, সৌর-বৎসরের দীর্ঘতা প্রভৃতির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ চলতো। অল-মামুন দামেস্কের বহির্দেশে কাসিয়ুন শৈলেও আর একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। সে-আমলে মানমন্দিরে রক্ষিত যন্ত্রপাতির মধ্যে উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র, আস্তর্লাব, সূর্যঘড়ি ও ভূ-গোলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আস্তর্লাব সম্পর্কে অন্য জায়গায় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, জ্যোতির্বিদ্যায় এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগতো।

অল-মামুনের জ্যোতির্বিদেরা ভূবিদ্যা সম্পর্কে একটা অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের নির্ণয় করেন—তাঁরা পৃথিবীর দীর্ঘতা কতো ডিগ্রি, তার হিসাবও নিরূপণ করেছিলেন। এর আসল উদ্দেশ্য ছিলো পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি নির্ণয় করা। পৃথিবীটা গোল—এই নির্দিষ্ট ধারণা নিয়েই তাঁরা গবেষণা চালিয়েছিলেন। ফোরাত নদীর উত্তরে পামিরার নিকটবর্তী সিনজিরার প্রান্তরে তাঁরা পরিমাপ কার্য চালান। তাতে মধ্যরেখার এক ডিগ্রি দৈর্ঘ পাওয়া গেলো সাড়ে ছাপ্পান্ন মাইল—এটা আশ্চর্যরকম নির্ভুল হিসাব, কারণ প্রকৃত দৈর্ঘ এই ডিগ্রিতে মাত্র ২৮৭৭ ফিট কম। এই হিসাবে পৃথিবীর পরিধি ২০,০০০ মাইল ও তার ব্যাস ৬৫০০ মাইল দাঁড়ায়। এই গবেষণাকারী জ্যোতির্বিদদলে বিখ্যাত অল-খারিজমীও ছিলেন। তাঁর 'জিজ'

এখানে ব্যবহৃত হয়। স্পেনের মসলেমাহ্-অল-মযরিতি (১০০৭ খ্রি.) খারিজমীর 'জিজের' সংশোধন করেন। ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে আডেলার্ড (Adelard of Bath) তার ল্যাটিন তর্জমা করেন এবং এইটাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্যোতির্বিদ মহলে গবেষণা কাজের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হতো। এই নির্ভুল জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রাশি (Table) গ্রীক ও ভারতীয় রাশির স্থান অধিকার করে ও সুদূর চীন-দেশেও সাদরে গৃহীত হয়।

ফারগনার বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আবুল আব্বাস আহমদ খলিফা অল-মুতায়য়াক্কিলের আমলে ফুস্তাতে একটা নিলোমিটার স্থাপন করেন (৮৬১ খ্রি.)। নিলোমিটার হচ্ছে পানি মাপার যন্ত্র এবং নামটা নীল নদ থেকে উদ্ভুত। আহমদের বিখ্যাত পুস্তক 'অল-মুদখিল-ইলা-ইলমে-হায়াত-অল-আফলাফ' ১১৩৫ সালে সেভীলের জন (John) ও গিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিনে অনূদিত হয়। পরে কিতাবখানার হিব্রুতেও তর্জমা করা হয়েছিলো।

বাগদাদে মুসা ইবনে-শাকিরের পুত্রেরা একটি নিজস্ব মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বুয়ায়িদ-সুলতান সরফ-উদ্দৌলা (৯৮২-৮৯ খ্রি.) বাগদাদে নিজের বালাখানায় একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। আর একজন বুয়ায়িদ সুলতান রুকনদ্দৌলার আমলে আবু-জাফর অল-খাজিন নামে খোরাসানের একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি অয়নমণ্ডলের তির্যকগতি নির্ণয় করেন এবং বিখ্যাত গ্রীক জ্যামিতিকার ও জ্যোতির্বিদ আর্কিমিডিসের (২৮৭-২১২ খ্রি. পূ.) একটি সম্পাদ্যের (Problem) সমাধান করে একটি ঘন সমীকরণ ফল বের করেন।

৮৭৭ থেকে ৯১৮ সালে অল-রাক্কায় অল-বাত্তানী নামে একজন মশহুর জ্যোতির্বিদ মৌলিক গবেষণা চালিয়েছিলেন। তিনি ইসলাম জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ—খ্রিস্টজগত Albatenius নামে তাঁর সংগে সুপরিচিত। তিনি টলেমির বহু মতামতের সংশোধন করেন এবং চন্দ্র ও আরো কয়েকটি গ্রহের কক্ষের গণনার ভুলও সংশোধন করেন। বাৎসরিক সূর্যগ্রহণের সম্ভাবনা তিনি বিশেষ যুক্তিতর্ক সহকারে প্রমাণ করেন এবং আরো নির্ভুলভাবে অয়নমণ্ডলের তির্যকগতি, গ্রীষ্মমণ্ডলে বৎসর ও ঋতুর দীর্ঘতা এবং সূর্যের সঠিক ও মধ্যবর্তী কক্ষের নির্ণয় করেন।

গজনীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ওস্তাদ অল-বেরুনী ১০৩০ সালে 'অল-কানুন-অল-মাসউদী-ফি-হায়াহ-ওআল-নজুম' নামে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে একখানা বৃহৎ অভিধানিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই একই বৎসরে তিনি 'অল-তফহিম-লি-আওয়াইল-অল-তানজীম' নামে জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে একখানা সংক্ষিপ্তসার পুস্তক রচনা করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আন-অল-কানুন-অল-খালিয়া'-তে তিনি প্রাচীন জাতিসমূহের পঞ্জিকা ও অব্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত

আলোচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর রচনা সমূহে সে-আমলের বহু বিতর্কিত বিষয় অক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তন সম্পর্কে প্রাঞ্জল ভাষায় বিচারসহ যুক্তি দ্বারা আলোচনা করেন এবং অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগুলি বেশ নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেন। ইসলাম জগতের এই সর্বতোমুখী প্রতিভার দান ইউরোপবাসিরা যুগে যুগে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করে আসছে।

সালজুক সুলতান জালালুদ্দীন মালিক শাহ (১০৭২-৯২ খ্রি.) জ্যোতির্বিদ্যার একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিশাপুরে তিনি একটি মানমন্দির স্থাপন করেন (১০৭৪-৭৫ খ্রি.)। এখানে গ্রহমণ্ডল সংক্রান্ত বাৎসরিক দীর্ঘতর নির্ভুল হিসাব অনুসারে রাজকীয় পঞ্জিকার সংশোধন করা হয়। এই পঞ্জিকা ইরান দেশের পুরাতন নিয়মানুগ ছিলো। তার সংশোধনের ভার দেওয়া হয় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, মনিষী, কবি ওমার খৈয়ামের হাতে। সাধারণ জগত আজ তাঁকে একজন যুক্তিবাদী কবি হিসাবেই ভালোরকম চেনে—তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন, কয়জনে সে খবর রাখে? তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা অক্লান্ত গবেষণা করে 'অল-তারিখ-অল-জালালী' বা জালালী-পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। নির্ভুলতার দিক দিয়ে জালালী-পঞ্জিকাখানা পোপ গ্রেগরী কর্তৃক ষোল শতকে প্রবর্তিত পঞ্জিকার (Gregarian Calendar, 1582) চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ও প্রামান্য। গ্রেগরীর পঞ্জিকায় ৩৩৩০ বৎসর অন্তে পুরো একদিন ভুল হিসাব পাওয়া যায়, কিন্তু ওমার খৈয়ামের হিসাবে প্রায় পাঁচ হাজার বছর বাদে একদিন ভুল হিসাব পাওয়া যেতে পারে।

চেংগিস খানের প্রপৌত্র হুলাকু বর্বরতার চূড়ান্ত দেখিয়ে শোভাসম্পদময়ী বাগদাদ নগরী ধ্বংস করেছিলেন (১২৫৮ খ্রি.)। তার পর বৎসর তিনি মরাগা মানমন্দির স্থাপন করেন ও সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ নাসিরুদ্দীন তুসীকে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি সেযুগের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ধরনের ছিলো। এখানে নাসিরুদ্দীন তুসী 'অল-জিজ-অল-ইল-খান' নামে সুপরিচিত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক রাশি (Table) প্রণয়ন করেছিলেন। হুলাগুর মানমন্দির খানার আজো অস্তিত্ব রয়েছে।

দশম শতকে স্পেনে বেশ উৎসাহের সংগে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা শুরু হয় এবং কর্ডোভা, সেভীল ও টলেডোর রাজকীয় দরবারে বিশেষ আদর লাভ করে। বাগদাদের আবু-মা'শারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহু স্পেনীয় জ্যোতির্বিদ বিশ্বাস করতেন যে দুনিয়ার জন্ম-মৃত্যুর কারণ-সম্পর্কে নাক্ষত্রিক প্রভাবের বিশেষ যোগাযোগ আছে। অতএব জ্যোতিষবিদ্যার সহকারী হিসাবে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার অবস্থান অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানের অবস্থান নিরূপণ করা আবশ্যক। এভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র জ্যোতির্বিদ্যার জননী হিসাবে স্বীকৃত হয়। স্পেনের

মারফতেই ল্যাটিনভাষী পাশ্চাত্যজগত জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাচ্যের অনুপ্রেরণা লাভ করে। স্পেনে বিখ্যাত আরবী জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থগুলির তর্জমা করা হয়। তেরো শতকে দশম আলফান্সো কর্তৃক সম্পাদিত আলফান্সাইন টেবল (Alfansine tables) আরবী জ্যোতির্বিদ্যার অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

স্পেনীয় জ্যোতির্বিদেরা প্রধানত আরিষ্টটলের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশ অবলম্বন করে গ্রহমণ্ডলীর গতিবিধি সম্পর্কে টলেমির মতামতগুলি আক্রমণ করতেন। কর্ডোভার অল-মজরিতী (মৃতঃ ১০০৭ খ্রি.), টলেডোর অল-যরক্কালি (১০২৯-৮৭ খ্রি.) এবং সেভীলের জাবীর-ইবনে-আফলাহ (মৃত ১১৪০ খ্রি.) স্পেনীয় জ্যোতির্বেত্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অল-মজরিতী সমসাময়িক সুধীসমাজে ইমাম বা পথ-প্রদর্শক হিসাবে সম্মানিত হতেন। তিনি খারিজমীর 'জিজ' সংশোধন করেন এবং ইরানী রাশিচক্রের বদলে ইসলামী নাম প্রবর্তন করেন। অল-যরক্কালি পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ-মহলে Arzachel নামে সুপরিচিত। তাঁর বহু সিদ্ধান্ত ও জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক প্রণালী রেমণ্ড (Raymond of Marseilles) নিঃশংকচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ টলেমির অতিরঞ্জিত হিসাবে বাষট্টি ডিগ্রি, খারিজমীর হিসাবে বাহান্ন ডিগ্রি, কিন্তু অল-যরক্কালির প্রায় নির্ভুল হিসাবে বিয়াল্লিশ ডিগ্রি স্থিরীকৃত হয়েছিলো। তিনি এক অভিনব উন্নত ধরনের আস্তর্লাব নির্মাণ করেন, তার নাম ছিলো 'সাফিহা'। নাক্ষত্রিক সম্বন্ধ অনুযায়ী সৌর-অপ-ভূর (Solar apogee) গতি নির্ণয়ে তিনিই প্রথমে কীর্তি অর্জন করেন। কোপার্নিকাস তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে (de revolutionibus orbium coelestium) অল-যরক্কালি ও অল-বাত্তানীর উল্লেখ সমানভাবে করে গেছেন। জাবীর-ইবনে-আফলাহ তাঁর বিখ্যাত 'কিতাব-অল-হায়াহ'-তে প্রমাণ করেন যে নিম্নস্তরের গ্রহ বুধ ও শুক্রের কোনো দৃশ্যমান স্থিতিবৈলক্ষণ্য নেই। এই পুস্তকে তিনি গোলীয় ও সমতল ত্রিকোণমিতি (Spherical and plane Trigonometry) সম্বন্ধে একটা উচ্চধরনের লিখিত অধ্যায় সংযোগ করেন। আমরা আজকাল যেসব ত্রিকোণমিতিক হার বা অনুপাত ব্যবহার করি, সেগুলির ইবনে-আফলাহ ও অল-বাত্তানী আবিষ্কারক হিসাবে সর্বদা স্বীকৃত না হলেও তাঁরাই যে সেগুলিকে লোকপ্রিয় করে তুলেছিলেন একথায় সন্দেহের অবকাশ নেই। নুরুদ্দীন আবু ইসহাক অল-বিতরুজী-(মৃত ১২০৪ খ্রি.) স্পেনের শেষ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি গ্রহমণ্ডলীর আপেক্ষিক অবস্থান সম্পর্কে সমকেন্দ্রিক নীতির এক অভিনব ধারা প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাব অল-হায়াহ' মাইকেল স্কট কর্তৃক ১২১৭ সালে ল্যাটিনে ও ১২৫৯ সালে হিব্রুতে তর্জমা করা হয়।

আরবীরা তাদের অক্লান্ত গবেষণার সুস্পষ্ট ছাপ আকাশেও রেখে গেছে—আজো তাদের জ্যোতির্বিদদের দেওয়া বহু জ্যোতির্বিষয়ক নাম অনেক গ্রহ-নক্ষত্রের গায়ে লেগে রয়েছে। আরবী আকরাব থেকে Acrab (বিছা), অল-জাদি থেকে Algedi (ছাগশিশু), অল-তায়ির থেকে Altair (মক্ষিকা) যনব থেকে Deneb (লেজ) ও ফরকদ থেকে pherked (গো-বৎস) নক্ষত্রের নাম গৃহীত হয়েছে। এইরকম জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ সংজ্ঞা হিসাবে অল-সমুত Azimuth বা দিগংশ, নাযির থেকে Nadir বা কুবিন্দু, অল-সমত থেকে Zenith বা সুবিন্দু, প্রভৃতি আরবী নামগুলি আজো তাদের সাধনাকে অমর করে রেখেছে।

চিকিৎসা

চিকিৎসা-বিদ্যায়, বিশেষত ভেষজ গ্রন্থাদি রচনায় মুসলমানরা আশ্চর্য উন্নতি করেছিলো এবং এক্ষেত্রেই ইউরোপে তাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয়।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও ভেষজতত্ত্বে আরবীদের প্রথম অবস্থায় অতি সামান্য জ্ঞান ছিলো। কোরআনে কোনো রোগ সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা দেওয়া নেই সত্য, কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানকে অবহিত করা হয়েছে। মুসলমানরা গ্রীকদের সংস্পর্শে আসার সংগে সংগেই চিকিৎসাবিদ্যায় তাদের বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান শুরু হয়। সিরিয়ায় জুন্দেশাপুরে যে বিজ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র ছিলো, সেখানে চিকিৎসা-বিদ্যা ও ভেষজতত্ত্ব সম্বন্ধেও বিস্তৃত গবেষণা করা হতো। সেখানকার একটি নেষ্টোরিয়ান-পরিবার আরবদের মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা বিতরণে বিশেষ সাহায্য করে। পর পর সাত পুরুষ ধরে এই পরিবারের কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণ গ্রীক চিকিৎসা ও ভেষজ গ্রন্থগুলি আরবীতে তর্জমা করেন। তাঁদের অনেকে আব্বাসী খলিফাদের প্রিয় চিকিৎসকও ছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় জালিনুস (Galen) লিখিত চিকিৎসা-বিদ্যার প্রাচীন পুঁথিগুলি আরব সমাজে সুপরিচিত হয়। গোড়ার দিকে আরবীদের উপর জালিনুসের প্রভাব এতো বেশী ছিল যে তাঁর শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই মুসলমানরা চিকিৎসা-বিদ্যায় অনুশীলন শুরু করেন। ৮৫৬ সালে হুনান-ইবনে-ইসহাক জালিনুসের রচনাগুলির একখানি তর্জমা বের করেন। তিনি ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুবায়াশ কেবল মাত্র গ্রীক চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ তর্জমা করতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে তাঁদের মৌলিক রচনার সংখ্যাও কমপক্ষে কয়েক শো ছিলো।

আরবী তর্জমাকারীরা প্রথম থেকেই চিকিৎসা-বিষয়ে বিভিন্ন Pandects (সংহিতা) রচনা করেছিলেন। সেগুলিতে ভেষজ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ থাকতো এবং মানবদেহের মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগের খুঁটিনাটি

আলোচনা থাকতো। আফসোসের কথা এই যে এ-সব মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থগুলির আজকাল অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র সাবিত-ইবনে-কুররা (৮২৬-৯০১ খ্রি.) লিখিত একখানা কিতাব কয়েক বছর আগে কায়রোতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই কিতাবখানায় তেত্রিশটি পরিচ্ছেদ আছে। তাতে স্বাস্থ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে; মানুষের সাধারণ অসুখ, লুকানো ও প্রকাশ্য ব্যাধিগুলোর পৃথক পৃথক বিবরণ আছে—মাথা থেকে বুক পর্যন্ত কোন কোন ব্যাধির আক্রমণ সাধারণত হয়, পাকস্থলী ও অন্ত্ররোগ সমূহের কারণ কি, ছোঁয়াচে রোগ কি কি ও সংক্রামিত হওয়ার আসল কারণ কি, রক্তদুষ্টি কেন হয় কিংবা ক্ষত কোন কারণে বিষাক্ত (septic) হয়ে উঠে—এসব বিষয়েরও সবিস্তারে আলোচনা আছে। এক কথায়, প্রত্যেক রোগের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসার উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে প্রাঞ্জল বর্ণনা তাতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আবহাওয়ার প্রভাব, পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত বিচার ও বিধি তাতে মেলে। এমনকি যৌন-সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনাও কিতাবখানায় করা হয়েছে। চিকিৎসা-বিদ্যায় আরবীদের জ্ঞান কতো গভীর ছিলো, গবেষণা কতো প্রখর ছিলো, এই গ্রন্থখানাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আরবীদের স্বর্ণযুগে Pandects-এর বদলে চিকিৎসা-বিদ্যায় বিশ্বকোষ সমতুল্য বিরাট গ্রন্থাদি সংকলন করা হয়েছিলো। একাজে ইরানী চিন্তানায়ক ও চিকিৎসকরাই সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিহারানের অল-রাজী (Rezes) ছিলেন নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসাবিদ এবং সকল যুগের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চাসনের অবিসংবাদী অধিকারী। তিনি বাগদাদে চিকিৎসা-বিদ্যা অভ্যাস করেন এবং গ্রীক, ইরানী ও ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে (চরক, শুশ্রুত) বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। যৌবনে তিনি আলকেমী সম্বন্ধে একনিষ্ঠ গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু পৌঢ় বয়সে চিকিৎসা-বিদ্যাই তাঁর একমাত্র ও প্রিয় সাধনা ছিলো। বাগদাদ শহরে তাঁর সমকক্ষ আর দ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলো না। তিনি কিছুকাল খলিফা অল-মুকতাদিরের প্রধান চিকিৎসকও ছিলেন। পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে দলে দলে রোগীরা তাঁর কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য ছুটে আসতো; খ্রিস্টান, ইহুদী, সিরীক, ইরানী প্রভৃতি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষার্থীর দল তাঁর পদতলে শিক্ষা লাভের আশায় ভীড় জমাতো।

অল-রাজী কম-সে-কম দুশো কেতাব রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে চিকিৎসা-সম্বন্ধেই একশোখানা ছিলো। চিকিৎসার প্রণালী, সাধারণ মানুষের রোগের প্রতি লক্ষ্য, চিকিৎসকের প্রতি মনোভাব, হাতুড়ে চিকিৎসক সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় কেন, প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ স্তরের কিতাবও তিনি রচনা করেছিলেন। প্রায় প্রত্যেক রোগ সম্পর্কেই তিনি ছোটো ছোটো পুস্তিকা লিখেছিলেন। বস্তি ও বৃক্কদেশে পাথুরী হয় কেন, এ-সম্বন্ধে তাঁর

একখানা মৌলিক তথ্যপূর্ণ রচনা আছে। শব-ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে বসন্ত ও হাম সম্পর্কে বিস্তৃত ও বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা। এই গ্রন্থখানার ল্যাটিন এবং ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই তর্জমা করা হয়। এক ইংরাজী ভাষাতেই ১৪৯৮ সাল থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে প্রায় চল্লিশবার গ্রন্থখানার তর্জমা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। খ্রিস্টজগত অল-রাজীর বদওলতেই এই দু'টি কঠিন ও মারাত্মক রোগ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান লাভ করেছিলো। সবরকম রোগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনাসহ চিকিৎসার প্রণালী দেখিয়ে অল-রাজী একখানা চিকিৎসা-বিষয়ক আভিধানিক গ্রন্থ রচনা করেন—তার নাম 'অল-হাবী'। তাতে গ্রীক, সিরীয়াক ও আরবী চিকিৎসা জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় দেখানো হয়েছিলো। এই গ্রন্থখানা কুড়িটি খণ্ডে বিভক্ত ছিলো, এখন তার মধ্যে মাত্র দশটি খণ্ডের অস্বিত্ব আছে। অ্যানজুর প্রথম চার্লসের (Charles I of Anjue) আদেশক্রমে সিসিলির ইহুদী চিকিৎসক ফারাজ-ইবনে-সলিম (Farragut) এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানার ল্যাটিনে তর্জমা করেন Liber Continens নাম দিয়ে। ১৪৮৬ সালের পর ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই অনুবাদখানা ক্রমাগত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে থাকে—১৫৪২ সালের মধ্যে সমগ্র গ্রন্থখানার পঞ্চম সংস্করণ হয়। তাছাড়া তার প্রত্যেক অংশের আলাহিদা মুদ্রন ও প্রকাশ অজস্রভাবে হয়েছিলো। এভাবে ইউরোপের চিকিৎসাক্ষেত্রে 'অল হাবী' অপূর্ব ও অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে—বিশেষত নবম খণ্ডটি ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ষোলো শতক পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিলো।

অল-রাজীর পরে ইরানের বাসিন্দা আলি ইবনে মজুসীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিও একখানা আভিধানিক ভেষজগ্রন্থ রচনা করেন এবং সমসাময়িক সুলতান আদাদ-উদ-দৌলার নামে উৎসর্গ করেন। তিনি হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন রকম রোগের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা এই ছিলো প্রত্যেক তরুন চিকিৎসকের উচিত প্রত্যেক রোগীর বিছানায় হাজির থেকে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ, বৃদ্ধি ও উপশমের গতি পর্যবেক্ষণ করা। খাদ্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামতগুলি ইউরোপের চিকিৎসকমণ্ডলী শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছিলেন।

ভেষজতাত্ত্বিক ও অস্ত্রচিকিৎসক হিসাবে আবুল কাসেম জাহরাবীর নাম (মধ্যযুগের Abulcasis বা Albucasis) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আরবী ভেষজ সম্বন্ধে তাঁর একখানা তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আছে। তবে অস্ত্রচিকিৎসাতেই তাঁর দান সবচেয়ে বেশী, পরে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। ইবন-অল-জাযযার (মৃত্যু ১০০৯ খ্রি.) গুপ্ত ব্যাধিগুলো সম্বন্ধে একখানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন, সেখানা ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়েছিলো।

কিন্তু তাঁদের সবার ঊর্ধে স্থান হচ্ছে হাকিম ইবনে-সিনার (Avicenna)। তিনি ছিলেন আরবী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূর্ত ও জ্বলন্ত সাক্ষী, তাদের জালিনুস—তাঁর দীপ্ত প্রতিভার কাছে অন্য সকল মধ্য-যুগীয় চিকিৎসক ও ভেষজতাত্ত্বিকের জ্ঞানের দীনতা-খর্বতা সহজেই প্রকট হয়ে উঠে। কম-সে-কম ছয় শতক ধরে সারা ইউরোপখণ্ডে তাঁর শিক্ষার অবিসংবাদী প্রাধান্য ও প্রভাব স্বীকৃত হতো। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অল-কানুন-ফিত-তিব' (Canons of Medicine) চিকিৎসাজগতের মধ্যমণি। চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের এরকম আশ্চর্য একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় নি। ইউনানী ও আরবী চিকিৎসা-জ্ঞানের এটাকে একটা বৃহৎ সংহিতা বলা চলে। তাতে মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের হরেক রকম লক্ষণ, ঔষধের ব্যবস্থা ও চিকিৎসার প্রণালী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ভেষজ-বিভাগের কমপক্ষে সাতশো ষাট রকম ঔষধের নাম ও উপকারিতার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মেডিয়া স্টিনিটিস (Media stinitis) ও প্লুরিসির (pleurisy) মধ্যে তফাৎ কোথায়, থাইসিস-রোগ সংক্রামক ও ছড়ায় কেন, পানি ও মাটি সংক্রামক রোগসমূহের বিস্তৃতির পথে কতোখানি সহায়তা করে, গেঁটে-বাত সম্বন্ধীয় রোগের উৎপত্তির আসল কারণ আন্ত্রিক জীবনু এবং তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, প্রভৃতি আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্মত উচ্চ ও মার্জিত গবেষণার দরুন ইবনে-সিনার গ্রন্থখানি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পনের শতকের শেষ পাদে কানুনের পনের বার ল্যাটিন সংস্করণ ও একবার হিব্রু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৫৯৩ সালে রোম শহরে তার আরবী সংস্করণ সর্বপ্রথমে ছাপা হয়। কিন্তু তার সর্বপ্রথম ল্যাটিন তর্জমা করেন বারো শতকের চিকিৎসাবিদ জিরার্ড (Gerard of Cremona)। তাঁর তর্জমাই ইউরোপের সর্বত্র সাদরে গৃহীত হয় এবং পূর্ববর্তী মনিষী জালিনুস, অল-রাজী, অল-মাজুসীর শিক্ষার পরিবর্তে একমাত্র কানুনই ইউরোপের প্রত্যেক শিক্ষাগারে চিকিৎসা বিষয়ের টেকসট্ বুক হিসাবে গৃহীত ও পঠিত হতে থাকে। বারো থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত ইবনে-সিনা ছিলেন পাশ্চাত্যের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রধান পথ-প্রদর্শক এবং তাঁর কানুন ছিলো প্রধানতম নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য পুস্তক। ডক্টর ওসলারের ভাষায়, 'কানুন অন্য যে কোনো পুস্তকের চেয়ে সবচেয়ে বেশীদিন চিকিৎসাজগতের বাইবেল ছিলো' (Dr. W Osler's Evolution of Modern Medicine)।

ইবনে-সিনা সোনা ও রূপার রোগমুক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং এরকম ধারণা করা অসম্ভব নয় যে তাঁর শিক্ষা থেকেই আধুনিক প্রণালীতে সোনা ও রূপার সূক্ষ্মপাত দিয়ে বড়ি (pill) মোড়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছিলো। তিনি হলদে রঙের চোখের ছানি নিরাময় করবার প্রণালীও জানতেন। আরো পনেরখানা চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের লেখক হিসাবে তাঁর নাম করা হয়ে থাকে। আজো

হামাদানে ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকের সমাধিস্থলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুধীবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সমবেত হন।

স্পেনে খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমান ও দ্বিতীয় হাকামের শাসন আমলে চিকিৎসা-বিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁদের একজন ইহুদী চিকিৎসক ডিওস্কুরাইড্‌স্ (Dioscurides)-এর বিখ্যাত মেটিরিয়া মেডিকাখানা আরবীতে তর্জমা করেন। তারপরে রাজভিষক ইবনে-জুলজুল সেই তর্জমার সংশোধন করেন ও বহু টিকা-টিপ্পনী সংযোগ করেন। কর্ডোভার বিখ্যাত চিকিৎসক আবুল কাসেম জাহরাবীর নাম আগেই বলা হয়েছে। কায়রোর আলী ইবনে রিদওয়ান (মৃত্যু ১০৬৭ খ্রি.) পাশ্চাত্য-জগতে Aaly Rodoam নামে সুপরিচিত। জালিনুসের বিখ্যাত গ্রন্থের যে-ভাষ্য তিনি আরবীতে রচনা করেছিলেন, সেখানা আবার ল্যাটিনে তর্জমা করা হয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসক-সমাজে তার বিশেষ কদর হয়। বাগদাদের ইবনে-বুলতান (মৃত্যু ১০৬৩ খ্রি.) ভেষজ-সম্পর্কে একখানা সার-সংগ্রহ রচনা করেন, সেখানাও ল্যাটিনে তর্জমা করা হয় এবং ইউরোপীয় চিকিৎসকদের হাত-কিতাব (ready reference book) হিসাবে প্রত্যেকের হাতে হাতে ফিরতে থাকে।

সমস্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টিকা দেওয়ার প্রথা মুসলমানদের অজ্ঞাত ছিলো না। আরবে জাহেলিয়াতের যুগেও টিকা দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো। তার দরুন মুসলমান চিকিৎসকেরা সহজভাবেই প্রথম থেকে টিকা দেওয়ার প্রথা গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপে লেডী মেরী ওয়াটলী মণ্টগিটুর ১৭২১ সালে সর্বপ্রথম টিকা দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি সম্ভবত কনষ্টান্টিনোপলের মুসলমানদের কাছ থেকে টিকা দেওয়ার প্রণালী শিক্ষা করেছিলেন। প্রথম প্রথম গোঁড়া পাদরীগণ টিকা দেওয়াটা মুসলমানী প্রথা হওয়ার দরুন তার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালিয়েছিলেন, কিন্তু বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টিকার উপকারিতা ইউরোপবাসীরা সহজেই হৃদয়ংগম করে ও ব্যাপকভাবে টিকা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করে।

নানা ঔষধের নাম বিকৃত-অবিকৃত অবস্থায় ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। এক রকম সুগন্ধি ভেষজ তরল পদার্থের ইংরাজী নাম 'জুলেপ' (Julep) আরবী 'জুলাব' ও ফারসী 'গোলাব' থেকে নেওয়া হয়েছে, সেইরকম 'রব' (rob) বা মোরব্বা আচারের নাম আরবী 'রাব' থেকে, 'সিরাপ' (syrup) আরবী 'শারাব' থেকে, 'সোডা' (Soda) আরবী 'সুদা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসা ও ভেষজতত্ত্বে আরবীদের দান অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃত হলেও অনেক ইউরোপীয় লেখক মুসলমানদের অস্ত্র-চিকিৎসায় পারদর্শিতা সম্পর্কে সন্দেহ

পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের সন্দেহ অমূলক, কর্ডোভার অস্ত্র-চিকিৎসা বিশারদ আবুল কাসেম অল-জাহরাবীই অস্ত্র-চিকিৎসায় মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'অত-তসরিক-লেমান-আযজ-অল-তালিফ্' দুই ভাগে বিভক্ত—শিক্ষাগত ও কার্যকরী। এই দ্বিতীয় ভাগেই হাকিম জাহরাবী অস্ত্র-চিকিৎসার প্রণালী এবং তার উপযুক্ত অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে অতি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত চমৎকার ও বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন। অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজনীয় বহু অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তিনি নিজেই প্রস্তুত করিয়েছিলেন এবং সে সবের চিত্র সম্বলিত উদাহরণও পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছিলেন। তার মধ্যে এই গুলি তাঁর নিজেরই আবিষ্কৃত নাকের ছিদ্রে ঔষধ দেওয়ার যন্ত্র, দাঁত তোলার যন্ত্র, দাঁতের গোড়া সাফ করার (scraping) যন্ত্র, দাঁতের গোড়ার গোস্ত কাটার যন্ত্র, চোখের ছানি অস্ত্র করার যন্ত্র, অন্ধ চোখ চিকিৎসা করার যন্ত্র, পলকের গোস্ত কাটার যন্ত্র, শরীরের যে কোনো স্থানের বর্ধিত গোস্ত চেঁচে ফেলার যন্ত্র, তীর বের করার যন্ত্র, মূত্রনালীর পাথুরি বের করার যন্ত্র, ভাঙা হাড় বের করার যন্ত্র, জরায়ুর মুখ প্রশস্ত করার যন্ত্র, জরায়ু থেকে কাটা গোস্ত বের করার যন্ত্র, মৃত ভ্রূণকে বের করার দু'রকম যন্ত্র, মৃত ভ্রূণকে অংগচ্ছেদ করার যন্ত্র ও সাধারণ অস্ত্র-চিকিৎসার কয়েকরকম দরকারী যন্ত্রপাতি। তাছাড়া কাষ্টকি করা বা তপ্ত লোহায় দগ্ধ করা, বস্তির (bladder) মধ্যেই পাথুরি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলা এবং শরীর ব্যবচ্ছেদ ও অংগচ্ছেদের বিজ্ঞানসম্মত উৎকৃষ্ট প্রণালীও জাহরাবীর কিতাবের দ্বিতীয় ভাগে বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধেও একটি আলাহিদা অধ্যায় তিনি নিজের পুস্তকে যোগ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে বহু আবশ্যকীয় শিক্ষা ও ব্যবস্থার কথা আলোচনা করেছেন। অস্বাভাবিক গর্ভপাত করার দরকার হলে কি কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত এবং তার আবশ্যকীয় চিহ্নাদি কি, সে-সম্বন্ধেও তাঁর কিতাবে আলোচনা আছে।

জহরাবীর পুস্তকের প্রথমভাগ তাদৃশ আদৃত হয় নি। কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্বিতীয় ভাগটি ইউরোপ বহু আদরের সংগে গ্রহণ করেছে ও নানাভাষায় অনূদিত হয়ে বার বার মূদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। এ-ভাগটি রচিত হওয়ার কিছু কাল পরেই ল্যাটিন, হিব্রু ও প্রভেন্স্যাল ভাষায় তার তর্জমা করা হয়—১৪৯৭ সালে ভেনিসে, ১৫৪১ সালে ব্রাসেল শহরে ও ১৭৭৮ সালে অক্সফোর্ডে তার ল্যাটিন অনুবাদের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অস্ত্র-চিকিৎসার পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে সালার্নো, মন্টপেলিয়ার ও অন্যান্য প্রাচীন ইউরোপীয় চিকিৎসা শিক্ষা-কেন্দ্রে বহু শতাব্দী ধরে এই গ্রন্থখানার অত্যন্ত আদর ছিলো এবং ইউরোপীয় অস্ত্র-চিকিৎসাবিদ্যার গোড়াপত্তন করতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো। মূল আরবী

গ্রন্থখানার এক কপি অতি প্রাচীন হস্তলিপি পাটনার বাঁকিপুরে খোদাবখশ লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে।

মুসলমানরা চিকিৎসা-বিদ্যার সংগে সংগে হাসপাতাল বসিয়ে রোগীদের চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত করেছিলো। তারা হাসপাতাল স্থাপনের আদর্শ অবশ্য গ্রহণ করেছিলো ইরানীদের কাছ থেকে—কারণ হাসপাতালের মুসলমানী নাম 'বিমারীস্তান' (বিমার-রোগ, স্তান-জায়গা) দু'টি ফারসী শব্দের সংযোগে উদ্ভব হয়েছে। জুন্দেশাপুরের সুবিখ্যাত চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্র ও হাসপাতালই সম্ভবত তা'দিগকে এ-আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলো। মধ্যযুগে মুসলমানদের অধ্যুষিত ও শাসিত দেশসমূহে অসংখ্য ছোট-বড়ো সরকারী ও জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতাল ছিলো—তার মধ্যে প্রায় চৌত্রিশটির বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে মেলে। বাগদাদে খলিফা হারুন-অল-রশীদের আমলেই (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়। তারপর দশ শতকের মধ্যেই বাগদাদে আরো পাঁচটি হাসপাতাল বসানো হয়েছিলো। কায়রোতে বিখ্যাত ইবনে-তুলুন ৮৭২ সালে হাসপাতাল স্থাপন করেন, পনের শতক পর্যন্ত তার অস্তিত্ব ছিলো।

ইসলামের ইতিহাসে এসব হাসপাতাল পরিচালনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক হাসপাতালের কেবল বাৎসরিক বরাদ্দেরই খতিয়ান মেলে না, চিকিৎসকেরা কতো বেতন ও মাসহারা পেতেন, শুশ্রুষাকারীরা (নার্স) কতো মাসহারা পেতেন, চাকর-নফরদের মজুরী বাবদ কতো খরচ হতো, রোগীদের খাবার, দুধ, ফল ও পোষাক বাবদ কতো খরচ পড়তো, সেসবেরও আলাহিদা হিসাব মেলে। এসব বিবরণ পড়তে পড়তে পাঠকের স্বতই মনে হবে, তিনি কোনো একটি ইউরোপীয় আধুনিক হাসপাতালের বিবরণী দেখছেন। প্রত্যেক হাসপাতালে স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য আলাহিদা বিভাগ থাকতো, প্রত্যেক বিভাগে অনেকগুলি ওয়ার্ড থাকতো, পৃথক ঔষধালয় থাকতো। অনেক হাসপাতালে রোগীদের জন্য এবং চিকিৎসকদের জন্যও কুতবখানা থাকতো।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক বড়ো হাসপাতালের সংগে চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্র (মেডিক্যাল কলেজ বা স্কুল) যুক্ত থাকে। সেই রকম মুসলমানী আমলের হাসপাতালগুলির সংগে শিক্ষাকেন্দ্রও থাকতো, সেখানে শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অধ্যাপনাও করতেন এবং হাসপাতালের রোগীদেরকে দেখিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাও দিতেন। তারপর ছাত্রদের পুঁথিগত ও অভিজ্ঞতালব্ধ (theoretical and practical) শিক্ষার আলাহিদা পরীক্ষা হতো ও উপাধিপত্র বা ডিপ্লোমা (ইজাযা') দেওয়া হতো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসব হাসপাতালে শিক্ষার্থীরা ভীড় জমাতো এবং মুসলিম চিকিৎসকদের কাছ থেকে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করতো। মধ্যযুগের মুসলিম হাসপাতালগুলির

পরিচালনার পদ্ধতি ইউরোপীয় হাসপাতালগুলির স্থাপনা ও পরিচালনার পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট আদর্শ দান করেছিলো, একথায় সন্দেহের অবকাশ নেই।

মুসলমানদের আমলে ভ্রাম্যমান হাসপাতাল ও ঔষধালয় অনেকগুলি ছিলো। বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লব্ধ বহু খ্যাতনামা চিকিৎসকের হাতে আলাহিদা আলাহিদা রোগের ঔষধালয় ও হাসপাতাল দূর দূরতম অঞ্চলে জনসাধারণের উপকারার্থে ঘুরে বেড়াতো। কয়েদখানার জন্যও পৃথক চিকিৎসক, হাসপাতাল ও ঔষধালয় থাকতো। এ থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে মুসলমানরা জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতোখানি সজাগ ও তৎপর ছিলো।

মুসলিম অধ্যুষিত প্রাচ্যে আজো আরবীদের চিকিৎসা-বিদ্যার সম্মান অসামান্য এবং আজো মুসলিম 'হাকিমের' কদর কমে নি। গ্রাম্য হাকিমের আজো প্রসিদ্ধ আরবী চিকিৎসাবিদদের রচিত গ্রন্থাদি থেকে হরেকরকম রোগের নিরাময় উদ্দেশ্যে ঔষধাবলী প্রস্তুত করেন, আজো প্রসিদ্ধ মুসলিম হাকিমের আরবী চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুসারী বিশেষ বিশেষ কঠিন ও দুরারোগ্য রোগের ঔষধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসী মুসলিম অমুসলিম আদর ও আগ্রহের সংগে ব্যবহার করে থাকেন এবং আজো ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ আরবী চিকিৎসা-বিজ্ঞান থেকে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের আশায় আরবী চিকিৎসা-বিদ্যার ভাণ্ডারে অনন্যমনে গবেষণা করে থাকেন।

স্থাপত্য

সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞানের মতো স্থাপত্যকলা শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভরশীল নয়—স্থপতিকে ইট, পাথর, কাঠ, লোহা-লক্কড় প্রভৃতি নিরেট বস্তু ও মাল-মসলা নিয়ে কারবার করতে হয় এবং আবহাওয়া ও ভৌগলিক অবস্থার, মাল-মসলার প্রাচুর্য প্রভৃতি হরেকরকম বাস্তব সুবিধা ও অসুবিধার দিকে সামঞ্জস্য রেখে কাজে নামাতে হয়। তার দরুন স্থাপত্য যতোটা স্থান ও কাল নির্ভর ও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য, অন্য বুদ্ধি-বৃত্তির ও মননশীলতার উপর নির্ভরশীল কলাবিদ্যা গুলি ততোটা নয়। বহু শতাব্দির বিস্তৃতির পরও এক দেশ হতে অন্য দেশে সাহিত্য বা দর্শনের ফ্যাশন বা সূত্র যেভাবে পুনরুজ্জীবিত, চর্চিত ও বিকশিত হতে পারে স্থাপত্যের কোনো নমুনা বা প্রথা ঠিক তেমনিভাবে স্থান বা কালান্তরিত হতে পারে না, কারণ স্থাপত্য হলো বাস্তবরূপ শিল্প এবং কাল, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক রুচি ও চাহিদার সংগে খাপ-খাইয়ে তার প্রয়োজন গড়ে উঠে। চাহিদা, মাল-মসলা ও কারিগর—স্থাপত্যের এই তিনটি অতি দরকারী ভিত্তিমূলের ঐক্যের উপরেই স্থপতি (architect) তাঁর আদর্শকে ইট-পাথরে রূপায়িত করতে পারেন। তার দরুন স্থানীয় প্রভাব বহুলাংশে স্থপতির আদর্শকে পরিবর্তিত বা সীমাবদ্ধ করতে দেখা যায়।

ইউরোপীয় স্থাপত্যে মুসলিমদের দানের সম্যক পরিমাণ নির্ণয় করা উপরের বর্ণিত হেতুমূলে এখনও কঠিন। প্রথম যুগে মুসলিমদের যেসব ইমারত নির্মিত হয়েছিলো, তার মধ্যে স্থানীয় ট্রাডিশন যে ছিলো না তা বলা যায় না, অর্থাৎ স্থানীয় কারিগর, মালমসলা ও প্রাচীন নির্মাণ কৌশলই যে মুসলমানরা নিজেদের কাজে লাগায় নি, তা বলা ভুল। আরবের মাটিতে কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের ফ্যাশন গড়ে উঠেনি, কারণ আরবীরা নাগরিক গৃহী নয়, তারা প্রধানত যাযাবর। কাবা-

শরীফের গঠনপ্রণালী কোনো বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেনি এবং করলেও তা ছিলো প্রাক-মুসলিম যুগেরই ধারা। তেমনই বাহিরের ঈষৎ সাদৃশ্য বা গঠন-প্রণালীর সমতা দেখে ইউরোপীয় স্থাপত্যে মুসলিমদের প্রভাব সম্বন্ধেও স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না, যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে আসলটির সত্যিকার উদ্ভাবক কে। আরবীদের কোনো নিজস্ব স্থাপত্য ছিলো না, তার দরুন একদল পণ্ডিতের মত এই যে মধ্যযুগের গথিক ষ্টাইলের (Gothic style) আসল উৎস মুসলিম প্রভাব নয়, তা রোমীয় ট্রাডিশন—যা রোম সাম্রাজ্যের মারফত সাত-আট শতক পর্যন্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভিসিগথ (Visigoth) ও অষ্ট্রোগথদের (Ostrogoth) দ্বারা পরিবর্ধিত ও রূপান্তরিত হয়। আবার অন্য দলের মত এই যে গথিক স্থাপত্য-কলা মুসলিমদের দ্বারা আনীত ও অনুপ্রাণিত হলেও আসলে তা সাসানীয়ান ষ্টাইলেরই রূপান্তর। একথা অবশ্য নিঃসন্দেহ যে, যেসব দেশে মুসলমানরা শাসন বিস্তার করেছে এবং যেখানে মুসলিম ইমারতের নিদর্শন মেলে, সেখানে পূর্বেকার স্থাপত্য শিল্পের ট্রাডিশন এমন কি নমুনাও তখন ছিলো। কাজেই সেখানকার শিল্প ও শিল্পী, এমনকি পুরানো ইমারতের মালমশলাও তারা নিজেদের দরকার ও আদর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করেছে এবং এক দেশের কারিগর নিয়ে যেয়ে অন্যদেশে ইমারত তৈয়ারী করেছে। সুতরাং বিভিন্ন দেশের শিল্প ও কারিগর আশ্রিত যেসব ইমারত মুসলিম জগতে যুগে যুগে নির্মিত হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো আংগিক ঐক্য বা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার না করা পর্যন্ত মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন তাগিদকে বলা চলে না এবং প্রাচ্যে সে-স্থাপত্যের প্রভাবের আলোচনাও অগ্রসর হতে পারে না।

এই বৈশিষ্ট্য হলো মুসলিম ধর্মপ্রকরণের চাহিদা, যা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারিগর ও মালমশলায় তৈয়ারী এই সব ইমারতের আংগিকরূপ নির্ধারণ করেছে। কারণ মুসলিম স্থাপত্যের গোড়াপত্তন হয় মসজিদ নির্মাণের কৌশল থেকেই এবং পরবর্তী কালেও মসজিদ ও তৎসংশ্লিষ্ট মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদির মধ্য দিয়েই এর বিকাশ হয়েছে। তাদের ইমারত ও কিল্লাগুলিও এই মসজিদের গঠন ও নির্মাণ কৌশলের প্রতিফলিত উৎকর্ষের ফল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মোহাম্মদ মদিনায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। তারই মডেল অনুসরণ করে নানাদেশের মুসলমানরা আপন আপন উপাসনা গৃহ তৈয়ারী করে। হজ্জ উপলক্ষে মদিনায় প্রত্যেক বৎসর দুনিয়ার প্রত্যেক জায়গা থেকে মুসলমানরা জমায়েত হতো; তাদের মধ্য থেকে শিল্পীরা মদিনার মসজিদের মডেল নকল করে আপন আপন দেশে মসজিদ তৈয়ারী করতো—এভাবে পৃথিবীর সর্বত্র একটা নির্দিষ্ট ধারানুযায়ী মসজিদ নির্মাণের কৌশল সংক্রামিত হয়। ৬৪২ সালে আ'মর ফুসতাতে মসজিদ নির্মাণ করিয়ে তাতে একটা 'মিম্বার' বা ইমামের দাঁড়ানোর জন্য উঁচু বেদী এবং একটি

'সাহন' (শান?) বা খোলা আঙিনা জুড়ে দেন। কিছুদিন পরে জমায়াত থেকে পৃথক করে একটা কাঠের জালির পরদা ইমামের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। সাত শতকের শেষের দিকে মসজিদের গুম্বজ তৈয়ার শুরু হয়। আরো কিছুকাল পরে আবহাওয়ার আক্রমণ থেকে আশ্রয় পাবার জন্য সাহনের চারিদিকে থাম নির্মাণের ও তার উপরে খিলানের কারুকাজ করা ছাদ তৈয়ারীর রেওয়াজ শুরু হয়। আট-নয় শতকের মাঝামাঝি কায়রোয়ানে নির্মিত জামে-মসজিদের সংগে প্রথম মিম্বার বা মা'আজিমা তৈয়ারী করা হয়। তার পর ওজু করবার জন্য আলাহিদা বন্দোবস্ত ও চৌবাচ্চা নির্মিত হতে থাকে। এ ভাবে নানা অংশ সম্বলিত মসজিদের একটা সম্পূর্ণ রূপ নির্দিষ্ট হয়ে যায়, আর কারিগর ও মালমশলার পার্থক্য সত্ত্বেও সমস্ত মুসলিম জগতে তা-ই ইসলামী স্থাপত্যের একটা নির্ভুল পরিচায়ক হয়ে আছে।

এই জামে-মসজিদের বিভিন্ন অংশের ডিজাইন ও গঠন প্রণালীর মধ্যে পুরাতন ট্রাডিশন আছে, দেশীয় কারিগরের প্রভাব আছে। এমনকি স্থানীয় পুরাতন সৌধের ভগ্নাংশও মাঝে মাঝে কাজে লাগানো হতো। তবুও এর পরিকল্পনা মুসলিম স্থাপত্যের প্রধানতম উৎস। এই জামে-মসজিদের সৌন্দর্য বিধানে ও দৃঢ়তাসাধনে বিভিন্ন অংশগুলির যে উন্নততর গঠন প্রণালী সৃষ্ট হয়, তা থেকেই বাসোপযোগী ইমারতাদির স্থাপত্যরূপ প্রভাবিত ও বিকশিত হয়। এই অংশগুলির গঠনপ্রণালী ও ডিজাইন বিশ্লেষণ করলে ইউরোপীয় স্থাপত্যে মুসলিমদের কাছে শেখা বা নকলকরা ধারাগুলি পরিষ্কার হবে।

৬৩৯ সালে নির্মিত কুফার মসজিদে ছাদ ছিলো, কিন্তু তার অন্য কোনো বিশেষ খিলান দেওয়ালের প্রয়োজন হয় নি, হীরার পুরাতন রাজপ্রাসাদ থেকে আনীত মার্বেল পাথরের থাম জুড়ে দিয়ে কাজ চালানো হয়েছিলো। কিন্তু প্রায় ষাট বছর পরে দামেস্কে খলিফা আবদুল মালেক নির্মিত, 'কুব্বাত-অল-সখরার' (যাকে সাধারণত খলিফা ওমারের মসজিদ বলে ভুল করা হয়) উপরে আচ্ছাদনের জন্য এবং একটা কেন্দ্রীয় সজ্জা হিসাবে গুম্বজের প্রথম ব্যবহার করা হয় এবং তার সংগে সংগে খিলানেরও নমুনা দেখা যায়। এই ইমারতটি কার্যত মসজিদ হলেও জামে-মসজিদের যা চলতি রূপ, তার থেকে বিভিন্ন এবং এধরনের মসজিদ বহু শতাব্দি পর্যন্ত আর নির্মিত হয় নি। এতে যে ধরনের গুম্বজ ব্যবহার করা হয়েছে, সেরকম গুম্বজ পূর্বেও তৈরী হয়েছিলো—রোমানদের ও বাইজাণ্টাইনদের গীর্জাতেও এধরনের গুম্বজ দেখা গেছে এবং আর্মিনিয়া এমনকি এশিয়া মাইনরের প্রাক-খ্রিস্টান যুগের ইমারতেও এই গুম্বজের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর মধ্যকার অর্ধবৃত্তাকার খিলান ও গবাক্ষমুখ খিলানের ধারক হিসাবে ব্যবহৃত থামগুলি এবং মেঝেতে মোজাইকের কাজ (mosaic) সে যুগেও সিরিয়াতে

নতুন ছিলো না। বরঞ্চ আরবদের জন্য এসব নতুন জিনিস ছিলো, কারণ খিলানের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুন তারা কাঠের কড়ি (সাহতীর) জুড়ে দৃঢ় করতে চেষ্টা পেয়েছে।

গুম্বজের আকৃতির বিবর্তন মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যায়, কিন্তু ইউরোপে এই বিবর্তনগত প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয় নয়। তবে একথা সর্বসম্মত যে রাশিয়া ও বলকান রাষ্ট্রসমূহে এমনকি জার্মানীতে যে 'প্রাচ্য-গুম্বজের' নজীর গীর্জায় দেখা যায়, তা মুসলিমদেরই মারফত পূর্ব ইউরোপে আমদানী হয়েছিলো। পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁর যুগে গুম্বজের প্রচলন হয়েছিলো, বিশেষ করে কুব্বাত-অল-সখরার প্ল্যানের অনুকরণে অষ্টকোণোকৃতি ভিত্তির উপর কেন্দ্রীক গুম্বজের দৃষ্টান্ত ইতালীতেও আছে। মিনারের সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে, কিন্তু গুম্বজের সংগে মিনারের ব্যবহারে যে পার্থক্য চৌদ্দ শতকের কায়রোর মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিলো, তারই নজীর দেখা যায় ষোল শতকের লণ্ডনের সেন্ট পলের ক্যাথেড্রল নামীয় প্রসিদ্ধ গীর্জায়।

মুসলিম স্থাপত্যের বিবর্তন বোঝা যায় খিলানের গঠন প্রণালী থেকে। কুব্বাত-অল-সখরার কিছু পরে দামেস্কে মসজিদ-অল-আকস নির্মিত হয়। দু'টিই পাথরের ইমারত, কিন্তু শেষেরটিতে এবং কোসায়ের-আম্মারার প্রাসাদে সর্বপ্রথমে ঘোড়ার নালের আকৃতিতে খিলানের (horse shoe arch) ব্যবহার দেখা যায়—এই আকৃতিই মুসলিম খিলানের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়ে যায়। এ-আকৃতির খিলান অন্য প্রাক-মুসলিম ইমারতেও পাওয়া গেছে, কিন্তু যে সব ছিলো আস্ত পাথরকে কেটে তৈয়ারী করা এবং তার ইমারতের দরকারী কোনো উপযোগিতা ছিলো না—এরকমটিই মসজিদ-অল-আকসায় সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিলো। হাতের কাছে পাওয়া তৈয়ারী পাথরের মালমশলা ব্যবহার করার গঠন পদ্ধতিতে কী পরিমাণে পরিবর্তন করতে হয়, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কায়রোয়ানের ও কর্ডোভার জামে-মসজিদ দু'টি। কর্ডোভার মসজিদে পুরানো তৈয়ারী থাম ব্যবহার করায় ছাদের উচ্চতা রক্ষার্থে পর পর দু'টি খিলান নির্মাণ করতে হয়েছে। পাথরের উপাদানে যে অসুবিধা, ইটের ব্যবহারে তা থাকে না এবং তৈয়ারী পুরানো অংশ ব্যবহারেরও সুযোগ থাকে না। তার দরুন ইটের ইমারতে পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ও নিখুঁত প্রকাশের সম্ভাবনা বেশী। মেসোপটেমিয়াতে ইটের ইমারতের নমুনা বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিলো এবং সেখানেই সর্বপ্রথম মুসলিম ইমারত ইট হতে নির্মিত হতে থাকে—তাতেই খিলানের গঠন ও আকৃতির বিবর্তনের সূত্রপাত দেখা যায়। আটশতকে নির্মিত ওখায়জির মসজিদে যে খিলান আছে তার আকৃতি পূর্বের পাথরের খিলান থেকে একটু স্বতন্ত্র—উপরের দিকে সামান্য কোণ-সম্বলিত এই

খিলান রাক্কাহ ও আবু-দুলাফের ঐ সময় নির্মিত ইমারতগুলিতে আরো সুস্পষ্টভাবে ছুঁচালো করা হয়েছে এবং এই ছুঁচালো ঘোড়ার নালের আকৃতির খিলানই পরবর্তীকালের মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম সাক্ষাৎ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ালো। এই বিশেষ আকৃতির খিলান ইউরোপে অনুসৃত হয়ে যে রূপ পেলো, সেই ছুঁচালো খিলান গথিক স্থাপত্যের সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। মেসোপটেমিয়াতে ও ইরানে উদ্ভাবিত আর এক আকৃতির খিলানও ইউরোপে বহুল পরিমাণে নকল করা হয়—তাকে সাধারণত ইরানী খিলান বলা হয়। ইংলণ্ডের ট্যুডর (Tudor) যুগের খিলানের সংগে দশ শতকের নির্মিত কায়রোর অল-আজহার মসজিদের খিলানের তুলনা করলেই এই সাদৃশ্য ধরা পড়ে। আব্বাসী খলিফা মুতাওয়াক্কিলের নির্মিত সামারার জামে-মসজিদের এখন মাত্র ধ্বংসাবশেষ আছে, কিন্তু তার বহিঃপ্রাচীর গবাক্ষ-মুখের বহুমুখী খিলানের দৃষ্টান্ত পূর্বে আর পাওয়া যায় নি। এই মসজিদেরই গঠন অনুযায়ী নির্মিত কায়রোর ইবনে-তুলুনের জামে-মসজিদেও (৮৭৬ খ্রি.) প্রাচীর গবাক্ষে অনুরূপ বহুমুখী খিলান আছে; এবং এরই অনুকরণ আমরা পাই ইউরোপের ফরাসীদেশে বারো শতকে নির্মিত La Sonteraine গির্জায়। ইংলণ্ডের ওয়েলস (Wales) ও স্যালিসব্যরী ক্যাথেড্রলে (Salisbury Cathedral) ও নরফোকের (Norfolk) গির্জায় ঠিক একই ছাঁচের হুবহু নকল করা হয়েছে। বস্তুত গথিক স্থাপত্যে দরজা বা গবাক্ষমুখকে এই ছাঁচের খিলান দিয়ে সাজানোর ফ্যাশন অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে ইউরোপে প্রচলিত ছিলো। কায়রোয়ানে ও সামারার মসজিদে প্রথম অনুসৃত খিলানের আর একটি বৈশিষ্ট্য মিসরে ও পরে স্পেনে নানারকম ছাঁচে ও উন্নতভাবে ব্যবহৃত হয়। খিলানের ভার রক্ষার জন্য যে থাম নির্মিত আছে, তার পাথরের অংশগুলিকে লোহা দিয়ে যুক্ত করার পদ্ধতি সামারার মতো ইবনে-তুলুনের মসজিদেও দেখা যায় এবং পরবর্তী আমলে এই কৌশল অবিকল পাশ্চাত্যের খিলান নির্মাণেও অনুসৃত হতে দেখা গেছে। কর্ডোভার মসজিদে ব্যবহৃত আর একটি প্রণালী হচ্ছে ঘন সন্নিবিষ্ট থাম ব্যবহার না করে জোড়া খিলান ও জোড়া জায়গা ফাঁক রেখে চওড়া ছাদ (wide vault) নির্মাণ করা—এ কৌশলটি ইউরোপ এখান থেকে বর্ণে বর্ণে শিক্ষা করেছে।

মসজিদের সংগে মিনারের দৃষ্টান্ত সর্বপ্রথম সামারার মসজিদে দেখা যায়। কিন্তু ইবনে-তুলুনের মসজিদের মতো সামারার মিনারে কোনো নতুন পরিকল্পনার পরিচয় নেই—প্রাচীন ব্যাবিলনীয় প্রথায় নির্মিত সিঁড়িবিহীন ঘোরানো পথওয়ালা গোলাকার এই মিনার পরবর্তী আমলে কোনো বিশেষ ধারার সূচনা করে নি। কিন্তু মিনার নির্মাণ মুসলিম স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট অংগ। এগারো শতক থেকে প্রাচ্যে ইট বা পাথরের মিনারের যে রূপ নির্দিষ্ট হতে থাকে, তার প্রাথমিক নমুনা হচ্ছে

মসুলের জামে-মসজিদ, গজনীতে সুলতান মাহমুদের মিনার ও দিল্লীতে কুতুব-মিনার। এসব মিনারের বৈশিষ্ট্য হলো ছুঁচালো বর্তুলাকৃতি (cylinder shape)—উপরের দিকে ক্রমশসরু হয়ে যাওয়া। মিসর ও স্পেনে মিনারের আকৃতি ভিন্নরূপে রূপায়িত হলো—যার বৈশিষ্ট্য হলো চৌকোণা ভিত্তির উপর তোলা, অথবা আগাগোড়াই চৌকোণা তলার উপর তলা গড়ে উঠেছে এবং শেষ তলা কোণ ও গুম্বজ বিশিষ্ট। এই ধরনের মিনার সেভীলের মসজিদে বারো শতকে প্রথম দেখা যায় এবং কায়রোর অল-জয়ুশীর মকবেরায় এর নমুনা তৈয়ারী হয়েছিলো। কায়রোর নিকটবর্তী সনজর-অল-জালীর মাদ্রাসার উপর মিনার, বারকাফের সমাধির উপর মিনারও পরবর্তী আমলে এই পদ্ধতিকে উন্নততর করতে সাহায্য করে। এই চৌকোণ মিনার ইউরোপে অত্যন্ত আদৃত হয় এবং দক্ষিণ ইউরোপে এর বহু নকল আরম্ভ হয় প্রায় বারো শতক থেকেই। সিসিলির গির্জাগুলিতে চূড়ার (steeple) গঠন দেখলেই আমাদের যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। আলি-আমালফি (Aaly Amalfi) ও সালার্নোতেও এই সারাসেনী মিনারের (Saracenic minaret) নমুনা দেখা যায়। রেনেসাঁর যুগে ইতালীতে নির্মিত Campanili বা ঘড়ির টাওয়ারগুলির ডিজাইন, এমনকি কারুকার্যও এই চৌকা মুসলিম মিনারেরই হুবহু নকল। লণ্ডনের রেন্ (Wren) নির্মিত এই সময়ের গির্জাগুলিতে চূড়ার আকৃতি ও গুম্বজের সংগে সাদৃশ্যকরণ চেষ্টা মুসলিম স্থপতিদের আদর্শেই করা হয়েছে। সেভীলের মিনারের গায়ে ছোটো ছোটো মিহরাব আকৃতির যে নকশা ব্যবহার করা হয়েছে, পরবর্তী আমলের গথিক টাওয়ার এমনকি ইংলণ্ডের ইভেশ্যামের (Evesham) (১৫৩৩ খ্রি.) ঘণ্টা-ঘরের বহির্দেশের রেখা অংকনের মধ্যে তারই প্রভাব আছে—পণ্ডিতরা এ সিদ্ধান্ত করেছেন।

ইমারতের মেঝে, ছাদ ও দেওয়াল বিচিত্র করণে (Surface decoration) মুসলিম স্থপতিদের বহু প্রথা ও ডিজাইন মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে ইউরোপে প্রচলিত হয়েছিলো। কায়রোতে প্রচলিত আড়াআড়িভাবে গাঁথুনীর দ্বারা সাদা ও কালো পাথরের ঠিক পর পর ব্যবহার করে যে মনোরম সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হতো, তারই নকলের নমুনা পাওয়া যায় পিসা, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি ইতালীয় শহরের গির্জাগুলির সম্মুখভাগের গাঁথুনীতে। ফরাসীদেশে ও ইংলণ্ডেও এর নমুনা বিরল নয়। প্রাচীর-গাত্র রেখা খোদাই করে নকশা কাটার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। ইমারতের উপরিভাগটা হরফ ও জ্যামিতিক নকশায় সুশোভিত করে তোলা মুসলিম স্থাপত্যের এক অপূর্ব কীর্তি। কাঠে বা পাথরে খোদাই করা, কিংবা চুণ-বালির আস্তরণের (plaster) উপর আঁকা হরফের,

জ্যামিতিক নকশার ও ফুল, লতা-পাতার ব্যবহার ইউরোপ মুসলমান ইমারতগুলি থেকে শিখেছে। ইবনে-তুলুনের মসজিদে হরফ খোদাই করে ইমারতের বহির্ভাগ সুসজ্জিত করার নমুনা আমরা সর্বপ্রথমে পাই—পরে প্রায় প্রত্যেক মুসলিম ইমারতেই এধরনের কারুকার্য একরকম অপরিহার্য অংগ হয়ে দাঁড়ায়। ইমারতের বহির্সৌন্দর্য প্রকাশে হরফ ও রেখার আশ্চর্য কারুকাজে মুগ্ধ হয়ে ইউরোপীয় স্থপতিরা কী পরিমাণে একে আত্মসাৎ করেছে, তার নজীর মেলে প্রায় প্রত্যেক গথিক ইমারতে—সেখানে অবশ্য ল্যাটিন হরফেই এই অনুকরণ বৃত্তি তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু একাজে মুসলিম বর্ণমালার যে শ্রেষ্ঠত্ব, তারই স্বীকৃতির নজীর দেখি ফ্রান্সের কয়েকটি গির্জায় কাঠের দরওয়াজার খোদাইএ। এমনকি ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যবীর (Westminister Abbey) কয়েকটি রঙিন কাচের জানালাতেও তার নজীর মেলে। কায়রোর সুলতান হাসানের মসজিদের গাত্রের ও নরফোকের (Norfolk) গির্জায় ল্যাটিন হরফের সংগে ব্যবহৃত টানারেখার কারুকার্যের যে একই উৎস তা সহজেই ধরা পড়ে। মোজাইকের চলন বোধ হয় মুসলমানদের বহু পূর্বেই হয়েছিলো। কিন্তু ইংলণ্ডে আরাবেস্ক (arabesque) নামে রাণী এলিজাবেথের সময় হতে হাল্কাভাবে খোদাই করা Conventional pattern এর প্রচলন দেখা যায়—তা-যে আরবী মুসলিমদেরই অনুকরণ তা এর নাম থেকেই বোঝা যায়। মসজিদে ব্যবহৃত গবাক্ষমুখে জ্যামিতির নকশায় পাথরের জালির পরদা (screen) থেকেই ইউরোপ প্লেটট্রেসারী শেখে। তেমনি বাসগৃহের জানানা-মহলের গবাক্ষমুখে কাঠের জালির পরদা বা 'মশরাবিয়া'র আদর্শেই ইংলণ্ডে গবাক্ষমুখে ধাতু-নির্মিত জালির (grille) ব্যবহার শুরু হয়।

নয় শতকের শেষের দিক থেকে বারো শতক পর্যন্ত মুসলমানরা অজস্র পরিমাণ কিল্লা, হিসার প্রভৃতি সামরিক ইমারত তৈয়ারী করেছিলো। এই যুগে ক্রুসেড যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয় এবং একথা সাধারণ হিসাবেই স্বীকৃত হয় যে খ্রিস্টীয় ধর্মযোদ্ধারা সিরিয়া ও মিসরের কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা থেকে বহু জ্ঞান অর্জন করেছিলো। তারা নয়া দুশমন মুসলমানদের সমরকৌশল ও আত্মরক্ষার উপায় অনেকখানি আয়ত্ব করতে বাধ্য হয়েছিলো। অনেকে বলেন, ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের আমলে সমকেন্দ্রিক দুর্গ নির্মাণের যে-রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়, তা জেরুজালেমের ল্যাটিন-রাষ্ট্রের অনুকরণ মাত্র; অথচ মুসলমানরা সিরিয়ায় যে-ধরনের কিল্লা তৈয়ারী করতো, খ্রিস্টানরা জেরুজালেমে তারই হুবহু অনুকরণ করেছিলো। ওয়েলসের (Wales) সীমান্ত ও দক্ষিণ ওয়েলসে যে-সব শিখর-মণ্ডিত ইমারতাদি দেখা যায়, সেগুলি ফিলিস্তিনের দুর্গ-নির্মাণের অনুকরণ মাত্র। এসব নজীর লক্ষ্য করে একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক (Prutz) বলেছেন পাশ্চাত্যের

কিল্লা ও হিসারের নির্মাণ কৌশল থেকে সহজেই ধরা পড়ে যে এগুলিতে আরবীদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। দুশমনকে প্রতিরোধ করবার জন্য পরিখা, প্রাকার প্রভৃতির নির্মাণ কৌশল প্রাচ্যে বেশ উন্নত ধরনের ছিলো এবং পাশ্চাত্যজগত মুসলমানদের কাছ থেকেই এসব শিক্ষা করেছিলো। সমকেন্দ্রিক দুর্গের ডবল-লাইন প্রাচীর নির্মাণ ও তার মধ্যে চূড়া বা টাওয়ার সাজানোর কায়দা আরবীরাই সৃষ্টি করে। ভেক্সিনে (Vexin) প্রথম রিচার্ড নির্মিত সেটু-গিলার্ড (Chateau Gaillard) কিল্লাটিতে আরবী প্রভাবের নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্গ-প্রাকারের বহির্ভাগে ঝুলানো প্যারাপেট বসানো এবং তার ভিতরে অবরোধ-নিরোধের সরঞ্জাম রাখার অভিনব প্রণালী (machicolation) মুসলমানদের কাছ থেকেই ইউরোপীয়রা শিক্ষালাভ করেছিলো, একথা আজ সর্ববাদিসম্মত। চৌদ্দ শতকে নির্মিত ফরাসী ও ইংরেজ সব কিল্লাতেই এই রকম বিশেষ ব্যবহারের চলন দেখা যায়। বাগদাদ নগরীর প্রাচীরে, কায়রোর সুলতান সালাহউদ্দীনের বালাখানায় ও আলেপ্পোর মশহুর ইমারতে বাঁকা ও ঘুরানো দরওয়াজা নির্মাণ কৌশল অভিনব ছিলো—শত্রু দ্বারদেশে হাজির হলেও ভিতরের দিকে লক্ষ্য করবার অথবা গোলাবারুদ ছোঁড়বার পক্ষে অক্ষম হতো। মুসলমানী এই কায়দা খ্রিস্টজগত হুবহু অনুকরণ করে—ইংলণ্ডে, ফরাসীতে ও ইতালীতে আজো এরকম দরওয়াজার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইবনে-তুলুনের মসজিদের বাহির-দেওয়ালের উপরকার ডিজাইন থেকেই ছিদ্রযুক্ত কিংবা আড়াআড়ি-ধরনের (Cross-shaped) দেওয়ালের (battlements) উদ্ভব হয়। কায়রোর মসজিদেও করাতের দাঁতের মতো প্রাকারের ব্যবহার আছে; তারই নকল দেখা যায় ভেনিসের ইমারতগুলিতে ও জার্মাণীর কয়েকটি প্রাচীন বাসগৃহের সম্মুখভাগে (facade)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের বাস করবার জন্য কোনো কোঠা-বালাখানা ছিলো না, দরবারের জন্য জাঁকজমকভরা ইমারত ছিলো না, কিংবা দেশ বিদেশের রাজা-রাজদূতদিগকে অভ্যর্থনা জানাবার মনোরম প্রাসাদ ছিলো না। কিন্তু ওমাইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংগে সংগে খলিফার জন্য ইমারত উঠতে থাকে এবং রাজতান্ত্রিক শান-শওকতের আনুসাংগিক দরবার ও শাসন দফতরের জন্য বড়ো বড়ো প্রাসাদও নির্মিত হয়। তাঁদের দেখাদেখি আমীর, দরবারী, প্রাদেশিক শাসক, সকলেই মনোরম প্রাসাদে বাস করতে আরম্ভ করেন। এভাবে মুসলমানদের অসংখ্য প্রাসাদ শোভিত শহরগুলির পত্তন হয়। তাঁদের প্রাসাদগুলিও মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারী গুম্বজ, খিলান-করা কাজ ও মিনার শোভিত করা হতো। এসব বসবাস যোগ্য ও দুনিয়াবী কাজের চাহিদানুযায়ী তৈয়ারী ইমারত এখন প্রায় সমস্তই ধ্বংস হয়েছে। পাথরের জালির কাজ, চকচকে টালি, নানা

রঙের পাথরের কাজ, লতা-পাতার চিত্র এবং আরবী হরফের বৈচিত্র্যের সমাবেশ এসব অট্টালিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো। স্পেনে কর্ডোভা ছিলো রূপসী তরুণীর মতো সম্পদ ও সৌন্দর্যের রাণী। অগণিত নয়নাভিরাম প্রাসাদে সুশোভিত কর্ডোভা সে-আমলে পৃথিবীতে অমরাবতীর তুল্য ছিলো। লাল রঙের আল হাম্বুরার বিস্ময়কর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইউরোপীয় স্থপতিগণ তার মডেল ও ডিজাইন এরকমভাবে অনুকরণ করতে শুরু করে যে 'আলহামব্রিক বা আলহামব্রেক্স' নামে স্বতন্ত্র মডেল ইউরোপে বিশেষভাবে আদরণীয় হয়ে উঠে। আলকাজের প্রাসাদটিও অপূর্ব এবং খ্রিস্টীয় স্থপতিদের অনুকরণযোগ্য ছিলো।

স্মৃতি-সৌধ নির্মাণে মুসলমানদের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী ছিলো। তারা যে দেশেই গেছে সেখানেই তাদের মশহুর শাসক, আলেম বা ধর্মনেতার সমাধিস্থলে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে তাঁদেরকে স্মরণীয় করে রাখতে চেষ্টা করেছে। এসব স্মৃতিসৌধের পাশাপাশি মসজিদ, মাদ্রাসা কুতুবখানা কিংবা সরাইখানা যুক্ত করে মানবতার সেবা ও ধর্মকর্মেরও ব্যবস্থা করা হতো। সেগুলির নির্মাণ কৌশল ছিলো মসজিদের ঢঙে—সেই গুম্বজ, খিলান, মিনারের বাহুল্য। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিতে এমন একটি মনোরম শালীনতা ও প্রসন্নতার ছবি ফুটে উঠে, যাতে দর্শকমাত্রেরই মনে স্বতই অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক ভাব জাগরিত হয়। মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের এই দিকের মধ্যমণি হচ্ছে তাজমহল, যার নির্মাণ-চাতুর্য ও গঠন সৌন্দর্য আজো বিশ্বের বিস্ময়স্থল হয়ে রয়েছে।

মুসলিম শহরগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো গোসলখানার আধিক্য। এর মূল কারণ হচ্ছে, মুসলমানরা দৈনন্দিন পাঁচবার নামাজের জন্য প্রত্যেকবার ওজু অর্থাৎ হাত-পা-মুখ ভালোরকম ধুয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। মুসলমানরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে কেবল ধর্মভাবের পূর্ণ অন্য স্তর (next to godliness) না ভেবে জীবনের একটা অপরিহার্য কর্তব্য করে নিয়েছে। মধ্যযুগীয় খ্রিস্ট সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের অপরিচ্ছন্ন থাকা এতোদূর অভ্যাস ছিলো যে, কোনো সন্ন্যাসিনী গর্বের সংগে বর্ণনা করেছেন যে তিনি জীবনের ষাট বছর বয়স পর্যন্ত গির্জায় যাওয়ার আগে কেবলমাত্র আঙুলের ডগাগুলি পানিতে ডোবানো ছাড়া আর পানি স্পর্শ করেন নি। খ্রিস্টানদের এরকম অপরিচ্ছন্ন থাকা অভ্যাস হলেও মুসলমান মাত্রেই পরিচ্ছন্নতার দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখে। তার দরুন তাদের শহরগুলিতে যেখানে-সেখানে অজস্র গোসলখানা দেখা যেতো। এক কর্ডোভা শহরেই নয়শো সাধারণ গোসলখানা ছিলো। পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক গোসলখানার বন্দোবস্তো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যেতো। ইংলণ্ডেশ্বরী মেরীর স্পেনবাসী স্বামী দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেন বিজয় করে সেখানকার সমস্ত গোসলখানা অধর্মের নিশানা

হিসাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপের সুরুচি মন ধীরে ধীরে গোসলখানা নির্মাণের প্রথাটি গ্রহণ করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হবে যে স্থাপত্য-শিল্পে মুসলমানদের কাছে খ্রিস্টজগত বহুল পরিমাণে ঋণী। মুসলমানী খিলানের কাজ, জালির কাজ, সূক্ষ্ম চূড়া তৈয়ারীর কৌশল, গুম্বজ, মিনার, জানালার উপরে ও নীচে ইট বা পাথরের কারুকাজ ইউরোপীয়রা বাসগৃহে, গির্জায়, সাধারণ মিলনাগারে, সর্বত্রই অসংকোচে গ্রহণ করেছে। ইট বা পাথরের পর্দা অথবা কাঠের স্থানান্তরযোগ্য পরদা (মশরাবীয়া) হেরেমে ও মসজিদে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। এ প্রথাটি ইউরোপীয়রা মুসলমানদের নিকটেই শিক্ষা করে। স্পেন থেকে মূর নির্বাসিত হলেও তার ট্রাডিশন স্পেন থেকে নির্বাসিত করা যায় নি—আজো তার স্থাপত্য শিল্পের মডেল ও ডিজাইন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্থপতিরা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সংগেই অনুকরণ করে এবং আজো মুরীয় ঢঙে ইমারত বানানো ইউরোপীয় আভিজাত্য-মহলে গৌরবের বিষয় হয়ে রয়েছে।

চারুকলা ও চিত্রকলা

প্রাণীর মূর্তি আঁকা বা গড়া মুসলিম শরিয়তের গোঁড়া মতানুযায়ী নিষিদ্ধ হওয়ায় ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা আরবী মুসলমানরা ততোটা প্রীতির চোখে দেখেনি। কিন্তু ইরানে ইসলাম জারী হওয়ার পর ইরানীদের মতো সৌখিন সমাজে এদু'টির পূর্ব থেকেই প্রচলন থাকায় অলংকারে, আসবাবপত্রে, গালিচায় প্রভৃতিতে মানুষের ও জীবজন্তুর ছবি এক শ্রেণীর মুসলমানদের সৌখিনতা ও রুচির তৃপ্তি সাধন করতো। তবে একথা সত্য যে গোঁড়া মুসলমানরা এসব কাজের বরাবরই জোরের সংগে প্রতিবাদ করতো। তার দরুন মুসলমান স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মসজিদগুলিতে কখনো এসবের প্রবেশাধিকার হয় নি। দুনিয়াবী ব্যবহার্য তৈজসপত্রে ও ইমারতগুলিতে এসবের নিদর্শন অবশ্য দেখা যেতো। একশ্রেণীর উদার ও মার্জিতরুচির লোক এসব সহ্য করলেও সময়ে সময়ে এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনেরও অভাব ছিলো না। তার দরুন বর্তমান কালে যেসব যাদুঘরে (museum) মুসলমানী ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলির অনেকই ধর্মান্ধতার দরুন আংশিক ভগ্ন বা নষ্ট অবস্থায় বিকৃতভাবে পাওয়া গেছে।

মধ্যযুগে কলাবিদ্যা ছিলো প্রধানত ও মূলত ধর্মের হাতধরা। খ্রিস্টীয় কলাবিদ্যায় কেবলমাত্র ধর্মের বিকাশ হরেকরকমে দেখানো হতো—অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোককে নানা বাস্তব ও দ্রষ্টব্য বস্তুর সাহায্যে ধর্মের মহিমা বোঝানোই ছিলো এবিদ্যার একমাত্র কাজ। কিন্তু তাদের একঘেয়ে মূর্তিপ্রবণতা আরবীদের চোখে নিছক পৌত্তলিকতা মনে হতো, কলাবিদ্যার চাতুর্য ও সৌকুমার্য তাদিগকে মুগ্ধ করতে পারে নি। তার উপর অত্যুগ্র সত্যনিষ্ঠার প্রথম যুগে মুসলমানরা সৌখিনতা ও বিলাসিতাকে ঘৃণার চোখে দেখতো, শয়তানের ফাঁদ হিসাবে মনে করতো।

কিন্তু কালের প্রবাহে মুসলমানরা নানাদেশ ও জাতির সংগে পরিচিত হতে লাগলো। বিজিত দেশসমূহের অগণিত রত্নভাণ্ডার ও বিলাসিতার শতসহস্র উপকরণ অহরহ অজস্র পরিমাণে আমদানী হতে লাগলো। তার ফলে রুক্ষ মেজাজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত যাযাবর আরবীদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সৌখিনতা ও বিলাসিতা অনুপ্রবিষ্ট হলো। কিন্তু মধ্যযুগীয় ট্রাডিশন অনুযায়ী মুসলমানী চারুকলার গোড়াপত্তন হয় ধর্মীয় ভাবধারার অনুসারী হয়ে। আরবী ভাষায় কোরআন লিখিত। অতএব আরবী হরফের আলংকারিক ব্যবহারে আরবী কলাবিদ্যার সূত্রপাত হয়। নিপুণ তুলিকায় দক্ষতা না থাকলে আরবী হরফকে লীলায়িত ও মনোরম ছাঁদে আঁকা কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলাম যতোই দেশবিদেশে প্রচারিত হতে লাগলো, ততোই একদল সুনিপুণ লিপিকার পুরুষানুক্রমে গড়ে উঠতে লাগলো এবং তাদের সুনিপুণ তুলিকাপাতে কোরআন শরীফের বাণীগুলি নানারকম লীলায়িত, ছাঁদে রূপায়িত হতে লাগলো। বসরা ও কুফাতে এরকম আলংকারিক ছাঁদে সাতশতকের লেখা কোরআন শরীফ পাওয়া গেছে। বাগদাদের আব্বাসী খলিফারা আট ও নয়শতকে এরকম আলংকারিক হরফে কিতাব নকল করার বিষয়ে শিল্পিদিগকে রীতিমতো উৎসাহ দিতেন। ক্রমে ক্রমে কোনো বিখ্যাত কবির কবিতার দু'চারটি বয়াত অথবা কোনো বিগত সাধকের বাণীর দু'চারটি কথা এরকমভাবে লিখে প্রকাশ্য স্থানে টাঙানোর রেওয়াজ শুরু হয়। ইউরোপীয় শিল্পীরা শীঘ্রই কলাবিদ্যার এই দিকটা অনুকরণ করতে শুরু করে এবং আরবী ভাষা পড়তে সক্ষম না হলেও আরবী হরফের সৌসাদৃশ্যে ল্যাটিন হরফে নিজেদের মুদ্রা ও ক্রশ অলংকৃত করতে থাকে। তাদের আঁকা যীশুখ্রিস্ট, মাতা মেরী ও স্বর্গীয় দেবদূতের বহু ছবির গাত্রবস্ত্রের পাড়ের উপর আরবী ঢঙে লেখা ল্যাটিন অক্ষরমালা শোভিত হতে দেখা গেছে।

পাশ্চাত্যের সুধীসমাজ মুসলমানদের পদতলে উপবেশন করে যে সমস্ত জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তার মধ্যে আস্তর্লাব (astrolabe) সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত দরকারী ও কার্যকরী হয়েছিলো। আস্তর্লাব একটা জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্র, সম্ভবত গ্রীকেরা তার আবিষ্কারকর্তা। টলেমি যন্ত্রটার জ্ঞান ও পরিচালনা বিষয়ে কিছুটা উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু মুসলমানদের হাতেই এই অতি দরকারী যন্ত্রটির বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং তার ব্যবহার ও উপযোগিতা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়। তারা এর সাহায্যেই দুনিয়ার বিভিন্নস্থান থেকে মক্কাশরীফের দিকনির্ণয় করতো ও নামাজের সঠিক সময় ও নির্ঘণ্ট এর সাহায্যেই করা হতো। দশ শতকে জ্ঞানী গারবার্ট (পরে পোপ অষ্টম সিলভেষ্টর) কর্ডোভা থেকে এই যন্ত্রটির বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং রোমের সঠিক অক্ষরেখা বের করেন। ইস্পাহানের প্রসিদ্ধ

জ্যোতির্বিদ ইবরাহিমের দুই পুত্র আহমদ ও মাহমুদ ৯৪৮ সালে যে-আস্তর্লাবটি নির্মাণ করেন, আজো তা অক্সফোর্ডে রক্ষিত আছে। এটিই সবচেয়ে প্রাচীন আস্তর্লাব। ১২৬০ সালে নির্মিত আর একখানি যন্ত্র বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। নৌচালকদের কাছে এই যন্ত্রটি পূর্বে অতি আদরের সামগ্রী ছিলো। পাশ্চাত্য জগত সতেরো শতক পর্যন্ত এর সাহায্যেই সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণ ও দিক নির্ণয় করতো। তারপরে উন্নত ও আধুনিক ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মিত হলে এর ব্যবহার কমে যায়।

মুসলমান পুরুষকে সোনা-রূপা ব্যবহার করতে শরীয়তী নিষেধ থাকলেও আব্বাসী খেলাফতের আমলে সোনা-রূপার অলংকার তো দূরের কথা, এদু'টি বহুমূল্য ধাতু নির্মিত বাসন-কোশন, আসবাবপত্রাদি তাঁদের শাহী বালাখানার রীতিমতো শোভাবর্ধন করতো। আল-মাকরিজীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শাহী স্বর্ণকারেরা সোনা-রূপার বাসন, পেয়ালা, তসতরী, পানদান, আতরদান, গোলাবদান, কলম, কলমদান, সতরঞ্জ খেলার ঘুটি, ছোট ছাতির বা লাঠির হাতল, ফুলদানী, পাখী, জীব-জন্তুর ছোট ছোট মূর্তি প্রভৃতি হরেকরকম ঘর-সাজানো আসবাব নানারকম ঢঙে ও মনোমুগ্ধকর ডিজাইনে তৈয়ারী করতো—সেসবে শিল্পিমনের যে-পরিচয় মিলতো, তাতে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এসব জিনিসের ব্যবহার খলিফার প্রাসাদ থেকে প্রত্যেক বড়ো বড়ো আমীর-সরদারের ঘরে দেখা যেতো। তাছাড়া পিতল, তামা, কাঁসার জিনিসপত্রও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। পিসা নগরীতে ব্রোঞ্জ ধাতুর নির্মিত পাখীর যে-অপরূপ মূর্তিটি দেখা যায়, তাও মুসলমানী ধাতব-কৃষ্টির অপূর্ব নিদর্শন। মুসলমানদের অভ্যুদয়ের পূর্বে খ্রিস্টজগতে সোনা-রূপা ও অন্যান্য ধাতু নির্মিত আসবাব পত্রের ব্যবহার অপ্রতুল ছিলো না, কিন্তু তাদের কাছ থেকেই ইউরোপীয়রা এদিকে নানা ছাঁচের ও ঢঙের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে শিখেছিলো এবং ধাতুর ঢালাই কার্যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছিলো। ব্রোঞ্জের ঢালাই করা স্মারক দ্রব্যাদি নির্মাণ করবার কায়দাও মুসলমানরা খ্রিস্টজগতে আমদানী করেছিলো।

সোনা-রূপার, বিশেষত পিতল-কাঁসার জিনিসপত্রে নকশার কাজে মুসলমান শিল্পিদের অপূর্ব দক্ষতা ছিলো। দামেস্কের কায়দায় বিশিষ্ট ভংগিতে (damascening) ধাতু কেটে কেটে নকশার কাজ ইউরোপে বিশেষ আদরণীয় ছিলো। বারো শতকে মুসলমানদের এরকম নকশার কাজ উৎকর্ষতা লাভ করে। স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত পিতল-কাঁসার আসবাব ব্যবহার এক বিশেষ শ্রেণীর আভিজাত্যের ফ্যাশন ছিলো। এধরনের গহনার বাক্স, কাসকেট, ফুলদান, শামাদান, দোয়াতদান, বদনা প্রভৃতি ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা বিশেষ আগ্রহ সহকারে এসব দ্রব্যাদি স্মারক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করতো। বৃটিশ

মিউজিয়াম এবং ভিক্টোরিয়া-আলবার্ট মিউজিয়ামে এরকম বহু স্মারকদ্রব্য আজো রক্ষিত আছে, তাদের নির্মাণ চাতুর্য আজো দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

কলাই ও মীনা করার কাজে মুসলমানদের দান অতুলনীয়। তারা প্রধানত তিন রকমে এনামেল বা কলাই করার কাজে ওস্তাদ ছিলো—ধাতুতে মীনা করা মৃন্ময় পাত্রাদিতে কলাই করা এবং কাচের উপরে মীনার কাজ করা। সোনারূপার অলংকারে, পাত্রাদিতে, তামা-পিতলের আসবাবপত্রে এবং ছাতা, ছুরি, তলোয়ারের হাতলে সূক্ষ্ম ও মনোহর মীনার কাজ করার রেওয়াজ ছিলো এবং ইতালী ও ফরাসীতে এসব দ্রব্যের অত্যন্ত সমাদর ছিলো। তবে মৃন্ময় পাত্রাদিতে কলাইএর কাজই মুসলমানদের হাতে চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তারা নিত্য ব্যবহার্য মাটির তৈজস-পত্রাদি এবং দেওয়ালে ও ছাতে লাগানো টালিও নীল, সবুজ প্রভৃতি এক-রঙা ও দো-রঙাভাবে কলাই করতো। এসব কাজের যে কয়টি নিদর্শন আজো ইউরোপের বিভিন্ন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, সেসব থেকে মুসলমানদের মৃৎ-শিল্পের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। পনেরো শতকে ইতালীয় মৃৎশিল্পীরা মুসলমানদের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করে। মৃন্ময় কারুকার্যে ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের সূত্রপাত মুসলমানদের আদর্শ থেকেই সূচিত হয়। তারা মাটির পাত্রে ভেষজ-দ্রব্য অবিকৃতভাবে রাখার প্রণালী মুসলমানদের কাছ থেকেই শেখে। মুসলমানদের নির্মিত ঔষধ-রাখা মাটির পাত্রগুলি ভ্যালেন্সিয়া থেকে ইতালীতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হতো। ইতালীতে এগুলির নাম ছিলো albarello, আরবী 'অল-বানিয়া' থেকে নেওয়া। সিরিয়ায় কাচের দ্রব্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হতো। মুসলমানরা তাদের নিজস্ব ডিজাইনে কাচের শিশি, বোতল, গেলাস, পানপাত্র, ফুলদানী প্রভৃতি তৈয়ারী করতো এবং সেগুলিকে নানা রঙের মীনার কাজে মনোরম করে তুলতো—সোনার পানি ঢালা মীনার কাজে এসব আসবাবের সৌন্দর্য আরো ফুটিয়ে তোলা হতো। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে ইউরোপে সিরিয়ার এরকম কাচের দ্রব্যাদির অত্যধিক আদর ছিলো। ভেনিসের কারিগরেরা এসব জিনিস তৈয়ারী করতে মুসলমানী ডিজাইন ও ঢঙ হুবহু অনুকরণ করতো। সেখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় এই শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি হয়। সতেরো ও আঠারো শতকে মীনার কাজ করা নানারকম কাচের সুরাসার-আধারগুলি মধ্যযুগীয় মুসলমান শিল্পিদেরই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়।

ঢাল বা বর্মে আভিজাত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্মারক-চিহ্ন আঁকার রেওয়াজ মুসলমানদের কাছ থেকেই ইউরোপে প্রচলিত হয়। কাচের পাত্রাদির উপরে বিশেষ ঢঙে মীনার কাজ করা এসব স্মারক-চিহ্নেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিলো।

মুসলমানরা মধ্যযুগে সূতার ও রেশমের বস্ত্র-শিল্পে বিশেষ উন্নতি সাধন করে। তাদের বুননের, রঙকরা ও চকচকে করার (mercerise) বিশিষ্ট কায়দা ছিলো এবং এক এক স্থানের প্রসিদ্ধিমূলক নামও ছিলো। ফুস্তাতের ফুস্তিয়া, দামেস্কের দামাস্ক, মসুলের মসলিন, বাগদাদের বালদাকো ও আতাবী রেশম এবং ইরানের তাফতা ইউরোপে বিশিষ্ট আঞ্চলিক সুনাম অর্জন করেছিলো। এসব বস্ত্র লাল, নীল, হলদে, কালো, ফিরোজা প্রভৃতি রঙের হতো এবং তার উপরে নানাবিধ পশু-পাখির ছবি নিখুঁতভাবে বোনা হতো। অনেক সময় আরবী হরফগুলিও নানাঢঙের লীলায়িত ছাঁদে বয়ন করা হতো। মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্য, বাগ-বাগিচার ছবি, এমনকি ঐতিহাসিক ও প্রেমমূলক কাহিনী অবলম্বনে চটকদার ছবিও বস্ত্রাদিতে বয়ন করা হতো। খসরু ও শিরীঁর, লায়লী ও মজনুর প্রেমমূলক ছবি-আঁকা বিচিত্র বস্ত্রের অস্তিত্ব থেকে মুসলমান বয়ন-শিল্পিদের নৈপুণ্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মেলে। মুসলমানরা রেশম ও সূতি বস্ত্রের বয়ন-শিল্প সম্পর্কে চীনাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছিলো সত্য, কিন্তু শীঘ্রই মুসলমানদের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য এই অতি-প্রয়োজনীয় শিল্প-বিভাগে প্রতিভাত হয় এবং তাদের টেকনিক, ডিজাইন ও আলংকারিক বৈচিত্র্য পাশ্চাত্যজগতের বস্ত্রশিল্পিদের নিকট আদর্শ ও শিক্ষণীয় হয়ে উঠে। সিসিলি অধিকারের পর রাজধানী পালার্মোর রাজপ্রাসাদে মুসলমানরা একটা বিরাট ও বিখ্যাত বয়ন-শিল্পাগার স্থাপন করে, সেখানে চারিদিক থেকে ইউরোপীয় বস্ত্র-শিল্পিগণ মুসলমানী টেকনিক ও ডিজাইন শিক্ষা করতে দলে দলে জমায়েত হতো। ইতালীর আদি বস্ত্রশিল্পীরা সিসিলি থেকেই বয়নশিল্পের প্রথম শিক্ষা লাভ করে। তেরো শতকের গোড়ার দিক থেকেই ইতালীর প্রধান প্রধান শহরগুলিতে রেশম-শিল্পের প্রসারবৃদ্ধি হয়—রেশমজাত নানারকম বস্ত্র সিসিলি থেকেই ইতালীয় সওদাগরেরা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করতো ও সারা ইউরোপে চালান দিতো। সে-আমলে আরবীদের নির্মিত পোষাক-পরিচ্ছদ এতোদূর সমাদর লাভ করে যে কোনো ইউরোপ বাসিই অন্তত একখানাও এরকম পোষাক না পরলে নিজেকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত মনে করতো না।

গালিচা আজকাল সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ-জিনিসটি প্রাচ্যের মুসলমানদের অতি মহার্ঘ্য বিলাসের সামগ্রী হিসাবে ইউরোপে সওদাগরেরা আমদানী করেছিলো। চৌদ্দশতক পর্যন্ত ইউরোপে গালিচা একটা উচ্চ আভিজাত্য সুলভ বিলাসবস্তু ছিলো, ষোল শতকে এটি সাধারণ পণ্যদ্রব্য হিসাবে ইউরোপে অজস্র পরিমাণে আমদানী হতে থাকে। ইউরোপীয় শিল্পীরা প্রথমে প্রাচ্যের ধারায় হস্ত কৌশলে সমতলমুখী গালিচা ও থোকাযুক্ত মখমলের মতো সুকোমল মসৃণ গালিচা বুনতে শিক্ষা করে। পরবর্তীকালে এই শিল্পটি ইউরোপে যন্ত্র সাহায্যেই প্রসার লাভ করে। কিন্তু ষোলশতকে মুসলমানরা গালিচা শিল্পকে যেরকম

উচ্চস্তরের রূপ দিয়েছিলো এবং টেকনিক ও ডিজাইনের দিক দিয়ে যেভাবে আদর্শ স্থানীয় করে তুলেছিলো, তার সমকক্ষতা লাভ করা আজও ইউরোপের পক্ষে সম্ভব হয় নি এবং তার দরুন ইউরোপের সমঝদার শ্রেণীর মধ্যে ইরানের হস্ত নির্মিত গালিচার আদর-কদর এতোটুকু ক্ষুণ্ন হয় নি।

মুসলিম শিল্পীরা কাঠ ও পাথর খোদাই করার কাজে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছিলো। এখানে একটি কথা বলা দরকার। মুসলিম চারুকলার বৈশিষ্ট্য এই যে, যেরকম ডিজাইন বা মডেলে একখানা চিত্রশোভিত পুস্তকের মলাট আঁকা হয়, সেই রকমেই রেশমী বা সূতি বস্ত্রের উপরে চিত্রিত করা যায়, এমনকি গুম্বজ বা কপাটের খোপ বা মসজিদের মিহরাব তৈয়ারী করতে অথবা দেওয়াল চিত্রিত করতে সেই একই রকম ডিজাইন ও মডেলের ব্যবহার দেখা যায়। মুসলিম শিল্পীরা কাঠ খোদাই করা অথবা জ্যামিতির বহুবিধ নকশার ডিজাইনে ঘরের ছাদের ভিতরদিক আচ্ছাদন করার নৈপুণ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলো। আবহাওয়ার প্রকোপে তাদের কাষ্ঠ-নির্মিত শিল্পদ্রব্য এতোটুকু সংকুচিত বা প্রসারিত হতো না, কিংবা কোনো ডিজাইন দর্শন কালে দূরত্বের তারতম্য হেতু এতোটুকু বেমানান লাগতো না। তাদের এসব কাজগুলির অতি সূক্ষ্মতা ও জ্যামিতিক নকশার অতি বাহুল্য হয়তো অত্যন্ত জটিল মনে হতো, কিন্তু মুসলিম শিল্পিদের সূক্ষ্মকাজে অপূর্ব হাতসাফাই তাদেরই বৈশিষ্ট্য সপ্রমাণ করতো।

হাতীর দাঁতের কাজে মুসলমানরা অপূর্ব শিল্পীমনের পরিচয় প্রদান করেছিলো। হাতীর দাঁত খোদাই করা, খচিত করা এবং আলংকারিক ভাবে কাটাই করার কাজে মুসলমান শিল্পীরা ওস্তাদ ছিলো। তারা হাতীর দাঁতের কাসকেট, আতরদান, গোলাবদান, মিষ্টান্নের পাত্র প্রভৃতি হরেকরকম বিলাসের উপকরণ প্রস্তুত করতো। এগুলি মুসলমানরা আভিজাত্যের ও বিলাসের উচ্চ নিদর্শনস্বরূপ ইউরোপে আমদানী করে এবং ইউরোপবাসিরা এসব জিনিস উপহার দেওয়ার সামগ্রী হিসাবে অত্যন্ত কদর করতো।

মুসলমানরা সমরকন্দ দখল করার পর (৭০৪ খ্রি.) চীনাদের কাছ থেকে ফাইবারের (fibre) কাগজ প্রস্তুত করার প্রণালী শিক্ষা করে এবং অনুমানিক বারো শতকে এই জিনিসটি ইউরোপ আমদানী করে। তারা প্রথমে স্পেনে ও পরে সিসিলিতে কাগজ তৈয়ারীর কারখানা খোলে। ইতালীয়রা এই শিল্পটি বিশেষ আগ্রহ সহকারে অনুশীলন করে। প্রায় পনেরো শতকে ইউরোপে যন্ত্রের সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত শুরু হয়। অবশ্য প্যাপাইরাস (papyrus) ও পার্চমেন্ট বা চামড়া থেকে প্রস্তুত কাগজের বহু পূর্ব থেকেই রেওয়াজ ছিলো। তবে একথা অনস্বীকার্য যে মুসলমানরাই কাগজে কিতাব লেখার ও বই-বাঁধাইএর রীতি ইউরোপকে শিখিয়েছিলো। ইউরোপ এদু'টির বদওলতেই শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ

করে এবং শুধু এই কারণেই খ্রিস্টজগত মুসলমানদের নিকট চিরকাল অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ থাকবে। গ্রন্থ সম্বন্ধে মুসলমানদের আর একটি বিশিষ্ট দান হচ্ছে শোভনীয় চামড়ায় বই-বাঁধাই এর কায়দা। রঙীন চামড়ার উপরে বিচিত্র কারুকাজ এবং সোনার ও রূপার পানিতে নাম লেখার ধারাটি মুসলমানদের সৃষ্টি এবং খ্রিস্টজগত এই বিদ্যাটি সম্যকভাবে মুসলমানদেরই কাছ থেকে শিক্ষা করেছিলো। কিতাবের পাতাগুলির সম্মুখভাগ সংরক্ষণের জন্য কিছুটা চামড়া ঝুলিয়ে রাখার বিশিষ্ট কায়দাটা মুসলমানদেরই কাছ থেকে ইউরোপ শিক্ষা করে।

অতঃপর চিত্রকলার কথা বাকী রইল। আমরা গোড়াতেই বলেছি যে, শরীয়তী অনুশাসনে মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে ইরান প্রভৃতি আরবেতর দেশে ইসলাম প্রচারিত হলে এই শরীয়তী অনুশাসন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং চিত্রবিদ্যা মুসলমানদের মধ্যে আদরণীয় হতে থাকে। তবু একথা অনস্বীকার্য যে শরীয়তের অনুশাসনের তাড়নার দরুন অন্যান্য শিল্পের মতো কেবল চিত্রকলাই আরবীদের হাতে সম্যক বিকশিত হয় নি এবং তার দরুনই ইউরোপে মুসলিম চিত্রকলার প্রভাব সেরকম অনুভব যোগ্য ছিলো না।

মুসলিম চিত্রকলার প্রথম অনুশীলন হয় কিতাবের পাতা শোভনীয়, রঙীন ও চিত্র-বিচিত্র করার ভিতর দিয়ে এবং এই কায়দাটি ইউরোপীয়রা মুসলমানদের কাছে গোড়া থেকেই শিক্ষা করেছিলো। মুসলিম জ্যোতিষীর আঁকা জ্যোতিষবিদ্যাবিষয়ক জীব-জন্তু—যেমন বিছা, সিংহ ইত্যাদি সম্বলিত কিতাব এগারো শতকেও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন ছিলো। আব্বাসী খলিফাদের আমলে ভেষজতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার ফলে মুসলমান তবীব বা চিকিৎসকদের কিতাবে প্রাণী-মূর্তি স্থান লাভ করেছিলো। ১২২২ সালের একখানি হাকিমী কিতাবে 'চিকিৎসকদের পরামর্শ নামক ছবিখানির চিত্রিত মূর্তিগুলি অপূর্ব। এসব কিতাবে মানুষের চিত্রদ্বারা তার বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের গঠন, সংযোজন ও প্রক্রিয়া দেখানোর রেওয়াজ ছিলো। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা মুসলমানদের কাছ থেকেই এই রেওয়াজটি শিক্ষা করেছিলেন।

চিত্রাংকনবিদ্যা পরবর্তীকালে ইরানের মুসলমান সমাজে ও ভারতের মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় এরকম উন্নত স্তরে পৌঁছেছিলো, যার ভূয়সী প্রশংসা ইউরোপের সুধীসমাজ মুক্তকণ্ঠেই করেছেন। প্রথিতযশা ইতালী চিত্রকর র‍্যাফেলের কিছু পূর্ববর্তী মুসলিম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর কামালুদ্দীন বিহজাদ, মিরাফ, ওস্তাদ মোহাম্মদ, রেজা আব্বাসী, মিরজা আলি, ভারতীয় চিত্রকর ফররুখ বেগ, জাল, খসরু কুলি, জামশেদ, মিসকিন, আগারেজা, ওস্তাদ মনসুর প্রভৃতির আঁকা বহু চিত্র আজো দেশবিদেশের সমঝদারের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁদের

ডিজাইন, টেকনিক ও মডেল অনেক-অনেক খ্যাতনামা চিত্রকর আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। মুসলিম চিত্রকরেরা ছবি আঁকতেন কোরআনের কাহিনীর উপর, শাহনামা, রজমনামা প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক কাব্যের উপর, জামী-নিজামীর প্রেমমূলক কাব্য-কাহিনীর উপর, সুলতান-বাদশাহদের স্মরণীয় অনুষ্ঠানের অথবা কোনো নৈসর্গিক বিষয়বস্তুর উপর। তাঁদের রঙের খেলার বৈচিত্র্য, তুলির বিশিষ্ট আঁচড় ও রেখাজালের যাদুকরী সন্নিবেশ দেশ-বিদেশের চিত্রবিদ্যা পিপাসুর আজো শিক্ষার খোরাক যোগায়।

সংগীত

একটি অতি পরিচিত হাদিসে উক্ত আছে : সংগীত-যন্ত্র শয়তানের মুয়াজ্জীন। বহু মুসলিম আলিম ও ধর্মতাত্ত্বিক সংগীতকে না-পসন্দ করেছেন—কেউ বলেছেন, এটি সবদিক দিয়েই হারাম; আবার কেউ বলেছেন, ধর্মের দিক দিয়ে এটি হারাম না হলেও মকরুহ। খ্রিস্টজগতে সংগীত ধর্মের সেবা করতো—গির্জায় সংগীতের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিলো। কিন্তু ইসলামে সংগীত ধর্মীয় অনুমোদন লাভ করা দূরের কথা, স্পষ্টভাবেই নিষিদ্ধ হয়েছিলো। তার দরুন সংগীতের স্থান মসজিদে ছিলো না, মুসলিম সমাজ-জীবনে দুনিয়াবী আনন্দের খোরাক হিসাবেই সংগীতের স্থান নির্দেশ হতো। আরব সমাজ-জীবনে সংগীত কতোখানি রসঘন আনন্দ জুগিয়েছিলো, আলিফ-লায়লা-ও-লায়লায় তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। তাতে জানা যায় যে আরব সমাজে সংগীতের কদর কিছু কম ছিলো না। আর এর আনুশীলনিক আর্টে আরবী ও অন্যান্য দেশের মুসলিম সুরশিল্পীদের দানও অসামান্য। নতুন নতুন সুরের মূর্চ্ছনার স্ফুরণে, বাদ্য যন্ত্রের উদ্ভাবনে ও উন্নতি বিধানে এবং সংগীত শাস্ত্রের বিশ্লেষণে মুসলমানরা বিশ্বের সভ্যতার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

জীবনের প্রত্যেক স্তরের উপযোগী সংগীত-চর্চায় আরবীদের উৎসাহ ছিলো। সুখে-উৎসবে, দুঃখে-শোকে, মিলন-বিরহে, যুদ্ধ-বিগ্রহে ও ধর্মীয় সাধারণ ক্ষেত্রে আরবী সংগীতের, বিশেষ বিশেষ রূপ ছিলো। আজকাল যে-কোনো ইউরোপীয় ভদ্রপরিবারে পিয়ানো না থাকলে যেমন চলে না, সেইরকম দশ থেকে তেরো শতক পর্যন্ত যে কোনো সংগতিসম্পন্ন আরব-পরিবারে গায়িকা না থাকলে চলতো না। তার দরুন শিক্ষা প্রাপ্ত সংগীত শিল্পীর একটি দল গড়ে উঠে, তাদের কদর আভিজাত্যাভিমানী আরব পরিবারে, এমনকি দামেস্কের ও বাগদাদের খলিফাদের দরবারে অত্যন্ত বেশী ছিলো। তারা সংগীতের সবদিকই চর্চা করতো। তবে কণ্ঠ-

সংগীতের চলনই অত্যন্ত বেশী ছিলো। আরবে কবিতার কদর বেশী থাকাতেই কণ্ঠ-সংগীতের চলন এতো বিস্তৃত হওয়া সম্ভব হয়েছিলো। কাসিদা, গজল, মওয়াল, কবিতাগুলি অপূর্ব সুর-সংযোগে গীত হতো—এগুলি মিলন-বিরহ সুখ-দুঃখ প্রভৃতি হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে প্রকাশলাভ করতো। মিছিল ও যুদ্ধযাত্রা নাকারা, নাফির, তবল, যমর, বুক, কাসা প্রভৃতি যন্ত্রের বাদ্যে শব্দমুখর হয়ে উঠতো। লড়াইএর বাজনায় মুসলমানদের বিশেষত্ব ছিলো; প্রত্যেক সেনাদলের বিশেষ ধরনের বাজনার বন্দোবস্ত থাকতো। ইউরোপীয়রা মুসলমানদের এই বিশেষত্বটি লক্ষ্য করে ও নিজেদের লড়াইএর বাজনায় তার প্রচলন শুরু করে।

জনসাধারণের উৎসবাদিতে ও জলসায় কণ্ঠ-সংগীত এবং যন্ত্র-সংগীত উভয়েরই চর্চা হতো। তবে স্ত্রীলোকেরা এসব ক্ষেত্রে তাম্বুরা বাজিয়েই গান গাইতে বেশী পছন্দ করতো। পেশাদার সংগীতজ্ঞরা এসব জায়গায় বেশ আসর জমাতো। তবলা ও শাহিন (একরকম বাঁশি) তাদের প্রিয় যন্ত্র ছিলো এবং একহাতে তবলায় ঘা দিয়ে ও আর হাতে শাহিন বাজিয়ে তারা অপূর্ব সুর তুলে গান করতো।

শরীয়তে সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ থাকলেও একদল মুসলমান সাধক বিশ্বাস করতেন যে, আধ্যাত্মিক পথে সাধনার পক্ষে সংগীতের যথেষ্ট প্রভাব আছে। সুফিরা বিশ্বাস করতেন যে, সংগীত ও নাচের ভিতর দিয়ে 'হাল' বা দশাপ্রাপ্তি হলে ওহি বা আল্লার বাণী পাওয়া যায়। আল-গাজ্জালী বলেছেন গান শুনতে শুনতে যে দশা ঘটে তাকেই 'হাল' (ধর্মীয় উম্মত্ততা) বলে। অন্য এক জায়গায় সংগীত ও 'হাল' সম্পর্কে আলোচনার কালে তিনি একথাও বলেছেন যে মানুষের মত্ততা সংগীতের সাহায্যে অতি সহজভাবেই আসে। আলিফ লায়লা-ও-লায়লায় লেখা আছে সংগীত কারো পক্ষে গোস্ত (খাওয়ার মতো অপকারী), আবার কারো পক্ষে ঔষধ।

এসব থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরবে ও মুসলমানদের মধ্যে সংগীতের চর্চা যথেষ্ট ছিলো এবং তাদের সংগীতের প্রভাব সমরকন্দ থেকে অতলান্ত দরিয়ার তীরবর্তী সকল স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছিলো। এ প্রভাবের যথেষ্ট নজীর মেলে বিদেশের সংগীত-বিজ্ঞানে আরবী ও ইসলামী পরিভাষার প্রাচুর্য থেকে।

বর্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীত চর্চায় পার্থক্য এতো বেশী প্রকট ও সুস্পষ্ট যে সংগীতে খ্রিস্টজগতে আরবী অথবা ইসলামী প্রভাব নির্ধারণ করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভভ মনে হয়। সুরের গমক, ধ্বনি ও সংযোজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে অনেকখানি আলাহিদা ধরনের। পাশ্চাত্য-সংগীত বিচিত্র-শব্দের ঐক্য ও সমন্বয় বা harmony আশ্রিত, আর আরবী, এমনকি সমগ্র প্রাচ্যের সংগীত বিশুদ্ধ সুর বা melody-র লীলায়িত বিকাশ ও গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্যামিতিক উপমায় বলা যায় যে, সংগীত পাশ্চাত্যে উল্লম্ব (vertical) এবং প্রাচ্যে

আনুভূমিক (harizontal) প্রথায় কল্পিত হয়েছে। আরবীতে তাল ও সুর-জ্ঞান (idea) ইউরোপীয় মূলতত্ত্বের (principle) বেশ খানিকটা বিপরীত। এই পার্থক্য কিন্তু দশম শতকের আগে এতোখানি সুস্পষ্ট ছিলো না। তখন পিথাগোরাসের স্বরগ্রাম দুই দেশেই চলতি ছিলো, সংগীত বিদ্যায় আরবীরা গ্রীক ও সিরিয়ার মূলসূত্র থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলো। আরবীরা মাত্রাবৃত্ত সংগীত (চিহ্ন দিয়ে স্বর, গ্রাম ও অন্তরার ভাগ নির্ণয় করা) সাধনা করতো এবং সুরের কারুকার্যে সমমাত্রিক ধ্বনির ব্যবহার তাদের জানা ছিলো। কিন্তু তখন ইউরোপীয় সংগীতের 'হারমনি' (harmony) বলতে যা বোঝায় তা একরকম অজ্ঞাতই ছিলো। আরবীদের মারফত এদু'টি পরবর্তীকালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

আরবী ও ইসলামী বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা এতো বেশী যে তার দশভাগের একভাগেরও নাম করা সম্ভব নয়। আরবীরা বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে বিশেষ ওস্তাদী দেখাতো এবং এ বিদ্যায় তাদের উচ্চস্তরের শিল্পিমনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের কলা-কৌশল সম্বন্ধে বহু কিতাব লেখা হতো এবং দামেস্ক, বাগদাদ, সেভীল প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের বহু কারখানা ছিলো। এক বীণাই ছিলো নানারকম আকারের, ধরনের ও গড়নের। প্রাক-ইসলামী যুগের বীণা 'মিজহার' ছাড়া ক্লাসিক যুগের বীণা 'উদ-কাদিম' আধুনিক যুগের ম্যাণ্ডোলীনের অনুরূপ ছিলো। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বীণার নাম ছিলো 'উদ-কামিল'। 'শাহরুদ' নামে আর একটি সুদৃশ্য নামকরা বীণার প্রচলনও খুব বেশী ছিলো। ইতালীয় প্যানডুরা (Pandura) যন্ত্রের অনুরূপ মুসলমানরা সবচেয়ে বড়ো 'তাম্বুর-তুর্কী' ও সবচেয়ে ছোটো 'তাম্বুর-বিগলিমা' যন্ত্র ব্যবহার করতো। তাদের মুরাব্বা ছিলো আধুনিক গিটারের মতো, পরে এই যন্ত্রটি 'কিতারা' নামে প্রসিদ্ধ হয়। রবার যন্ত্রটি আরবীদের বৈশিষ্ট্য—ভারতে এর অন্য নাম হচ্ছে রুদ্রবীণা। রবারের নানারকম আকার ও গড়ন ছিলো, তাদের মধ্যে কামানজা' ও 'ঘিসাক' ছিলো মশহুর। তারের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে জংক, সন্‌জ, কানুন, নুজহা ও সিনতারের নাম উল্লেখযোগ্য। কাঠের বাদ্যযন্ত্র আধুনিক কালের ফ্লুটের মতো নানা আকারের ছিলো। ন্যয়-বাম যন্ত্রটি লম্বায় তিন ফুট এবং শাব্বাবা ও জুয়াক মাত্র একফুট করে ছিলো। সাফ্‌ফরার চলনই ছিলো সবচেয়ে বেশী। নলের তৈয়ারী ফ্লুটের মধ্যে জমর, স্যরনয়, জুলামী, গয়তা এবং ধাতু-নির্মিত বুক সবচেয়ে বেশী আদরণীয় ছিলো। যে কোনো আকারের ও গড়নের তবলাকে সাধারণ নামে দফ বলা হতো। ঢোলকের মতো তবল, নাকারা, কাসা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিলো।

আরবী মশহুর সংগীতজ্ঞেরা আপন আপন রুচি মাফিক বহু বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। অল-ফারাবীর নিজের বিশেষ ধরনের রবার ও কানুন যন্ত্র ছিলো, অল-জুলম (নয়শতকের প্রথম ভাগ) ন্যয়-জুলামী বা জুলুমী নামক নতুন ধরনের

ফ্লুট তৈয়ারী করেন; জলজল (মৃত্যু ৭৯১ খ্রি.) উদ-অল-শাববুত যন্ত্র আমদানী করেন; দ্বিতীয় হাকাম (মৃত্যু ৭৯৬ খ্রি.) বুক বীণার উন্নতি সাধন করেন; যিরয়াব (নয় শতক) বীণার বিভিন্ন গড়ন সৃষ্টি করেন; অল-বায়াসী ও আবুল-মজদ (এগারো শতক) বহু নতুন ধরনের বাদ্য যন্ত্রের আমদানী করেন এবং শফীউদ্দীন আবদ অল-মুমীন নুজহা ও মুঘনী নামক বাদ্যযন্ত্রের প্রবর্তন করেন।

এসব আরবী বাদ্যযন্ত্রের ও যন্ত্র-সংগীতের প্রভাব ইউরোপে কিছু অল্প ছিলো না। আজকাল অনেক সংগীতজ্ঞ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন যে পশ্চিম ইউরোপীয়রা বহু আরবী বাদ্যযন্ত্রের নাম ও গঠন-চাতুর্য হুবহু নকল করে—lute, rebec, guitar, nakor প্রভৃতি যন্ত্রগুলির নাম আরবী অল-উদ, রবাব, কিতারা, নাক্কারা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। Lute, pandore ও guitar শ্রেণীতে কতোরকম আরবী বাদ্যযন্ত্রের প্রবেশাধিকার আছে, তার হিসাব পাওয়া কঠিন। এই রকম ছড়ি দিয়ে বাজানো অসংখ্য আরবী যন্ত্র ইউরোপে আদরের সংগে গৃহীত হয়েছে। এ সম্বন্ধে সেন্ট ইভাঞ্জেল (St. Medard Evangel, 8th. century), লোথায়ার (Lothair) ও লাবু সাল্টার্স (Labeo Notkar Psaltars, 9th-10th centuries) লিখিত বর্ণনা থেকে যথেষ্ট নজীর পাওয়া যায়। আরবী বাদ্যযন্ত্রগুলি ইউরোপকে অন্য একদিকে বাস্তবভাবে উপকৃত করেছিলো। আরবের সংগে যোগাযোগের আগে ইউরোপীয় গায়কেরা তারের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কেবলমাত্র এক ধরনের সিতার (cithara) ও বীণার সাহায্যেই গান করতো এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সুর বাঁধতো। আরবীদের কাছ থেকে ইউরোপ lute, pandore ও guitar শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও আরবী কায়দায় ফরিদা বা ফরদর-এর অনুরূপ আঙুল রাখার তবকে (finger board) জোর দিয়ে সুর নিয়ন্ত্রণ প্রথা সর্বপ্রথম শিক্ষা করে। এটা সংগীত-বিদ্যায় নিশ্চয়ই প্রগতিমূলক শিক্ষাদান।

সংগীত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরবীরা অল্প-বিস্তর সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলো। ইউনুস অল-খাতিব ছিলেন এ বিষয়ের পথ প্রবর্তক (মৃত্যু ৭৬৫ খ্রি.)। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে অল-খলিল (মৃত্যু ৭৯১ খ্রি.) সুর মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ইবনে-ফারনাস (মৃত্যু ৮৮৮ খ্রি.) সর্বপ্রথম আন্দালুসে সংগীত বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। আট ও নয় শতকের মধ্যে সংগীত বিজ্ঞান ও স্বর বিজ্ঞান সম্বন্ধে সমস্ত বিখ্যাত গ্রীক গ্রন্থগুলি আরবীতে তর্জমা করা হয়। তার মধ্যে প্লেটো ও এরিষ্টটলের সংগীত ও সুর সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

নয় শতকের অল-কিন্দির সংগীত বিষয়ক গ্রন্থগুলি আজো বেঁচে আছে, তার মধ্যে সংগীত শিক্ষার প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় ও সুর সাধনার বিশেষ নিয়ম সম্বন্ধীয় কিতাবগুলিই উৎকৃষ্ট। অল-ফারাবীই আরবীদের মধ্যে এবিষয়ে সবচেয়ে মশহুর লেখক। সংগীতের ধারা ও শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর মতামত আজো অনেকের

শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাঁর পরে ইবনে-সিনা সংগীত সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন। তাঁর 'শিকা' ও 'নাজাত' সংগীত সাহিত্যের অনবদ্য অবদান। তিনি আর্ট হিসাবে সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। তেরো শতকে শফী-অল-দীন আবদ-অল মুমীন (মৃত্যু ১২৯৪ খ্রি.) Systematist School-এর প্রতিষ্ঠা করেন। অল-ফারাবীর পরে সংগীত-বিজ্ঞান বিষয়ে তিনিই শ্রেষ্ঠ আরবী লেখক। সপ্তম-সুর যোজনার সম্বন্ধে তাঁর মতামত ইউরোপে সবচেয়ে নিখুঁত হিসাবে গৃহীত হয়েছিলো। তাঁর প্রবর্তিত দলের অনুসৃত স্বরগ্রাম নির্ভুল হিসাবে আজো খ্যাতি পেয়ে থাকে।

ইবনে-সিনা ও অল-ফারাবীর সংগীত-সাহিত্য ইউরোপে সতেরো শতক পর্যন্ত একমাত্র প্রামাণ্য হিসাবে সকল শ্রেণীর আদরণীয় ছিলো। আরবীরা কেবল গ্রীক সংগীত বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক ছিলো না, তার যথেষ্ট উন্নতি সাধনও করেছিলো। গ্রহচক্রের গতিজনিত শব্দ ও সুরের যে বিচিত্র লীলা চলে তার সামঞ্জস্য বিধানে আরবী সংগীত-সাহিত্য স্রষ্টাদের চেষ্টা ও দান অপরিসীম, আজো সুরশিল্পী ও সংগীত রসিকগণ অকুণ্ঠভাবে তাঁদের এ-ঋণ স্বীকার করে থাকেন।

উৎকৃষ্ট গীতাবলীর সংকলন, গীত রচয়িতা ও বিখ্যাত গায়কদের জীবনী লিপিবদ্ধ করায় আরবীদের অত্যন্ত উৎসাহ ছিলো। অল মসউদী (মৃত্যু ৯৫৭ খ্রি.) তাঁর 'সোনার ক্ষেত' নামক উৎকৃষ্ট কিতাবে আরবী গীতাবলীর সঞ্চয়ন করেন ও আরবী সংগীতের প্রথম যুগের ধারা সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তাঁর অন্যান্য কিতাবে বিদেশী-সংগীত বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছিলো। অল-ইসপাহানী (মৃত্যু ৯৬৭ খ্রি.) একুশ খণ্ডে গীতাবলী সংকলন করেন, এখানি আরবী গীত সঞ্চয়ন হিসাবে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইবনে খলদুনের 'আরবী দেওয়ান'ও মশহুর কিতাব। আন্দালুসে আবদ-রাব্বিহী (মৃত্যু ৯৪৯ খ্রি.) 'অনুপম কণ্ঠহার' নাম দিয়ে একখানি সংগীত সমষ্টি প্রকাশ করেন। তাতে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের জীবনীর আলোচনা ছিলো এবং সংগীত সমর্থনে শরীয়তের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তিতর্ক ছিলো। এসব সংগীত-সঞ্চয়ন গ্রন্থগুলির ইউরোপে যথেষ্ট কদর হয়।

মধ্যযুগে আরবী ও মুসলমান পেশাদার গায়কগণ দেশে দেশে সফর করে গান গেয়ে বেড়াতো। তাদের বিচিত্র ও বিশিষ্ট পোশাক ও প্রসাধন বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। তাদের গানের সর্বত্র অসম্ভব কদর থাকায় বিদেশীরাও তাদের অনুকরণে বিচিত্র পরিচ্ছদ ও প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে পেশাদারী সংগীত চর্চা শুরু করে। ইউরোপীয় গায়করা মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া চুল রাখতো ও মুখে রঙ লাগাতো ঠিক আরবীদের অনুকরণে। মরিস গায়ক-সম্প্রদায় (Morris-Moorish dancers) আরবী গায়কদের হুবহু অনুকরণে বেশ বিন্যাস করতো; এমনকি তাদের কাঠের ঘোড়া ও ঘণ্টা ঘুঙুরও ব্যবহার করতো। স্পেনের বাস্ক প্রদেশে

কাঠের ঘোড়ার নাম যামালযাইন (Zamalzain)—একথাটি আরবী 'যমিল-অল-যাইন' শব্দ থেকেই নেওয়া হয়েছে। এই রকম আরবী 'মশকরা' থেকে স্পেনীয় mascara ও ইংরাজী masker শব্দ নেওয়া হয়েছে—কথাটির আসল অর্থ ভাঁড় বা বিদূষক বা নাট্যকার। এছাড়া Zambra, Zarabanda, huda, mourisca প্রভৃতি আরো অনেক সংগীতার্থক শব্দ খাঁটি আরবী থেকে ধার করা হয়েছে। এমনও অনেকে অনুমান করেন যে ফরাসী ট্রুবাডুর (troubadour) শব্দটি আরবী 'তরবার' বা গায়ক শব্দ থেকেই রূপলাভ করেছিলো।

আরবীদের সাহচর্যে ইউরোপ সংগীত শাস্ত্রে যে সব জ্ঞানলাভ করে তার মধ্যে স্বর-বিজ্ঞানে মাত্রাজ্ঞানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটি আরবী পেশাদার ভ্রাম্যমান গায়কদলের মারফতেই ইউরোপ শিক্ষালাভ করে। বারো শতকে রচিত কলোন (Cologne) নগরীর ফ্রাংকোর সংগীত-গ্রন্থে যে তালরক্ষার পদ্ধতি দেখা যায়, তাও আরবীদের কাছে শেখা। আল-মুয়ায়হিম, আর-মুআরিফা, আলেন্ত্রাদ প্রভৃতি যেসব ধ্বনি ও সুরের নাম ল্যাটিন সংগীতগ্রন্থে পাওয়া যায়, তার আরবী উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতরা নিঃসন্দেহ। স্বরগ্রামে মাধুর্য ও বৈচিত্র্য উৎপাদনে আরবীরা ওস্তাদ ছিলো। তাদের কাছ থেকেই ইউরোপীয় গায়করা বিভিন্নসুরের সমন্বয় (harmony) করতে শিক্ষালাভ করে। আরবী ভাষায় বিভিন্ন সুরের সমন্বয় করাকে 'তরকিব' করা বলে। আরবী তরকিব করা থেকেই ইউরোপের সুর-সমন্বয় জ্ঞান জন্মে। বিভিন্ন সুরের সমন্বয়ে যে অপূর্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়, তার প্রথম প্রেরণা আরব থেকেই এসেছিলো। ইউরোপে অরকেস্ট্রা (orchestra) বাদকদল সংগীতে আজকাল যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে, তার মূলে রয়েছে আরবী ও মুসলিম গায়কদের তরকিব সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান, সে-বিষয়ে আজকাল আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

কৃষ্টিগত ঐক্য ও জীবনাদর্শ

মধ্যযুগে মুসলিম অধ্যুষিত ও মুসলিম শাসিত দেশগুলির মধ্যে একটা একধারাত্মক তাহজিব ও তমদ্দুন গড়ে উঠেছিলো। এই তাহজিব ও তমদ্দুনকে প্রদেশগত বৈশিষ্ট্যের গণ্ডীর মধ্যে ফেলে সংকীর্ণ ও রুদ্ধ করে ফেলা হয়নি—ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর মধুর শিক্ষার কল্যাণে ভৌগলিক সীমারেখার উর্ধ্বে মানুষে মানুষে অপূর্ব সাম্যভাব ও সহনশীলতা গড়ে উঠে। এই অপূর্ব শিক্ষাটি ইউরোপেও মধ্যযুগে ছড়িয়ে পড়ে—তার দরুন খ্রিস্টীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সত্ত্বেও মানবীয় ঐক্য ও সমজাত্যের ভাব ছড়িয়ে পড়ে। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) খেলাফতের আদর্শে বিশ্বময় খ্রিস্টীয় সমাজকে এক-ধর্মীয় কাঠামোতে আনতে চেয়েছিলো। কিন্তু শীঘ্রই অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপে একদেশিক জাতীয়তাবাদ (Nationalism) মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার ফলে ইউরোপ অসংখ্য নেশান ও ন্যাশানালিজমের গণ্ডীর মধ্যে বহুধায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—ইউরোপের অখণ্ডত্ব ও ঐক্যভাব লুপ্ত হয়। এই ন্যাশনালিজমের স্রোতে ইসলাম জগতেরও একতা রীতিমতো ভেঙেচুরে যায়। বর্তমানে আরবী ভাষাভাষী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে আরব ইউনিয়ন গড়ে তোলার প্রচেষ্টার দ্বারাই একথাটা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাদের মধ্যে আগেকার একতার অভাব ঘটেছে। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, এখনও সারা ইসলাম জগতে এমন একটা ধর্মগত আদর্শ এবং তাহজিব ও তমদ্দুনগত ঐক্যের বাঁধন আছে যা অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারলে জগত লাভবান হতে পারে। অধ্যাপক ইয়ং (T.C.Young) বলেন বর্তমান জগত যুধ্যমান শক্তিগুলির হাতে কেবলই ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা কোনো অলৌকিক বিচারক বা শালিশের অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকারই করে না—কিন্তু জীবনধারায় বৈষম্যের বালাই বিহীন

সংহতি-বিধানে ইসলামের অত্যুচ্চ শিক্ষা প্রত্যক্ষে না হলেও নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্নভাবে আজকালকার মানুষের আধ্যাত্মিক অভাব মেটাবার পক্ষে একটা উৎকৃষ্ট অবদান।

ইসলামের আর একটা বিশিষ্ট শিক্ষা হচ্ছে, জাতি, বর্ণ ও পদ-মর্যাদাগত বৈষম্যহীন আশ্চর্য উদারনীতি ও সহনশীলতা। খ্রিস্টজগত হয়তো মিশনারিদের মুখ দিয়ে, না হয় প্রচার-বিভাগের মারফতে গালভরা মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মহান বাণী নিউ টেষ্টামেন্ট (New Testament) থেকে উদ্ধৃত করে বিশ্ববাসীকে শোনাতে পারে, কিন্তু ইসলাম বর্ণে বর্ণে ভেদজ্ঞান তুলে দিয়ে মুসলমানদিগকে প্রকৃত উদারনীতিতে সহজভাবে শিক্ষাদান করেছে। এখানে ইসলামের সব চেয়ে বড়ো শিক্ষা হচ্ছে, কথার চেয়ে বাস্তব কাজে মানুষকে স্বাভাবিকভাবে অনুসারী করে তোলা। এ সম্বন্ধে ইয়ং সাহেব একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন একবার একজন আমেরিকান এক অশিক্ষিত ইরানী মুসলমানকে একখানা মাসিক পত্রের ছবি দেখাতে দেখাতে কতকটা লজ্জার সংগে স্বীকারই করেন যে, একখানা ছবিতে দক্ষিণ আমেরিকার একজন রেড ইণ্ডিয়ান সভ্য ও শ্বেতবর্ণ আমেরিকানদের হাতে লিঞ্চ (Lynch, বিচার না করেই জনতা কর্তৃক অপরাধীকে প্রহার করতে করতে মেরে ফেলা) করার যে দৃশ্যটা দেখানো হয়েছে, সেটা সত্যি ঘটনা, তখন ধর্মভীরু মুসলমানের মতো আকাশপানে হাত তুলে ইরানীটি চিৎকার করে বলে উঠেছিলো আল্লার শোকর যে আমি একজন সভ্যদেশের বাসিন্দা।

ইসলামের আর একটি শিক্ষা হচ্ছে গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে প্রত্যেক মানুষের অধিকার ও মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া। এই গণতান্ত্রিকতার অর্থ আধুনিক খ্রিস্টজগতের মতে ইসলামী ধারণা থেকে অনেকটা আলাহিদা—দুয়ের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ রয়েছে। খ্রিস্টজগত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিকতার সবচেয়ে প্রাধান্য দিয়েছে, কিন্তু ইসলাম রাষ্ট্রে, সমাজ-ব্যবস্থায়, ধর্মীয় আচরণে ও মানুষে মানুষে আচার ব্যবহারে গণতান্ত্রিক নীতি সমানভাবে মেনে নিয়েছে। মানব জীবনের সব স্তরে ও সকলক্ষেত্রেই তার এই সমানাধিকারের দাবী স্বীকার খ্রিস্টজগত যতো সহজে করতে শিক্ষা করবে ততোই পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণ নেমে আসবে। ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতি গ্রীকদের মতো দাসদাসী প্রপীড়িত অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, হিব্রু ধর্মবেত্তাদের মতো সামাজিক উচ্চ নীচ ভেদজ্ঞানের ভিতর নয়, অথবা গ্রীক রোমীয় সভ্যতার বর্তমান দাবীদার ও হিব্রু ধর্মনীতির শেষ শিক্ষা নিউটেষ্টামেন্টের তথাকথিত অনুসারী ইউরোপবাসীর কথা ও কাজের মতো নয়। যে সেমিটিক যাযাবর জাতিসুলভ সবল বলিষ্ঠ মন, স্বচ্ছ ধর্মীয় বিশ্বাস ও দলগত সম্মান রক্ষার অদম্য উৎসাহ মুসলমানরা লাভ করেছিলো, তাই তারা বহু শতাব্দী-ব্যাপী জাতীয় আদর্শ হিসাবে আঁকড়ে ধরে

বিশ্বের বুকে বহু অসাধ্য সাধন করেছিলো। সেসব থেকে বস্তুতান্ত্রিকতার উপাসক ইউরোপ কি মহৎ শিক্ষা লাভ করে নি? পৌরহিত্যের প্রাধান্য বর্জিত তৌহিদ-পন্থী ও মানুষে মানুষে সমানাধিকারের দাবীর সমর্থক ইসলাম কি খ্রিস্টজগতকে তার শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পত্তির কোনো অংশ দান করে নি? উনিশ শতকে ইউরোপে যে মানবতার সেবার আন্দোলন দেখা যায়, মানুষের অধিকার ও মানব-জীবনের পবিত্রতা রক্ষার যে আদর্শ রাজনীতি ও সমাজকে প্রভাবিত করে এবং যার ফলে দাসপ্রথা উচ্ছেদ, বিশ্বময় মানবতার সেবার জন্য মিশনারী প্রেরণ প্রভৃতি মানব হিতকর কার্যে ইউরোপকে এই সময় সচেষ্ট দেখা যায়, তার মূলে ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সামাজিক আদর্শ অলক্ষ্যে কার্য করেছে।

এখানে প্রসংগক্রমে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ও খ্রিস্টমত দুইটাই প্রচারশীল ধর্ম। কিন্তু প্রচারণার দিক দিয়ে এদুয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম প্রচার ক্ষেত্রে ভৌগলিক সীমারেখা এবং মানুষের প্রকৃতি-সুলভ আবহাওয়াকে দুষ্ট ও কলুষিত করে নয়া ধর্মে দীক্ষিত মানুষের আত্মাকে বিপন্ন করে তোলে নি, তার স্বচ্ছন্দ জীবনধারায় বীভৎসতা আনয়ন করে নি। আফ্রিকায় খ্রিস্টানেরা ধর্ম-প্রচার করতে যেয়ে সেখানকার বাসিন্দাদিগের জাতীয়তা জ্ঞান লুপ্ত করে দিয়ে বিসদৃশ মিশ্রজাতির সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতির এই নিরীহ সন্তানগুলিকে ধর্ম-প্রচারের অজুহাতে ইউরোপীয়ানায় নকল নবীশ করে তোলার কশরত মানবতার দিক দিয়ে নিছক অমার্জনীয় অপরাধ। কারণ তা'দিগকে মানুষ-খচ্চরে পরিণত করা হয়েছে। জিরাফকে কুমীর বানানো অথবা অজগরকে জলহস্তী করার মতোই আফ্রিকাবাসীকে ইউরোপীয়ান করে তোলার উৎসাহ অত্যন্ত হাস্যকর। ইসলামের এ শিক্ষা নয়, এ-পথও নয়—অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় ইসলাম কখনো দেয় নি। প্রাকৃতিক সমাজব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে তার শিক্ষা নয়—রক্ত-মাংসের মানুষ নিয়ে তার কারবার, কোনো অধরা (absolute) আদর্শকে স্থান-কাল-পাত্রের বাইরে ইসলাম স্থাপন করতে চেষ্টা করে নি। মানুষের দুর্বলতা ও সীমাকে স্বীকার করে নিয়ে তার সংগে সামঞ্জস্য রেখেই যুগে যুগে ইসলাম মানুষকে উন্নত জীবন ও ধর্মের আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে—অতিমানব বা অমানুষ করার চেষ্টা সে কখনো করে নি। তার এই মহান ও সহজ দৃষ্টান্ত এতোদিনে ইউরোপবাসীরা অনুসরণ করতে শুরু করেছে, এর ফল শুভ, সন্দেহ নেই।

ইসলাম তথা মুসলমানরা ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে ইউরোপবাসীকে কি কি শিক্ষা দিতে পারে তাও ভেবে দেখা দরকার। পাশ্চাত্যের অতি-উৎসাহী, কোপন-স্বভাব ও একগুঁয়ে খ্রিস্টানরা প্রাচ্যের নির্লোভ, শান্ত, বিনয়ী ও স্বল্পে-তুষ্ট মুসলিমের

কাছে জীবন-যাত্রার মান ও চালচলন সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিক্ষা করতে পারে। কেবল মুসলমানদেরই এ সব গুণ রয়েছে একথা আমরা বলি না, তবে তাদের মধ্যেই এগুলি প্রবলভাবে বিদ্যমান। কোনো এক ইউরোপীয় লেখক স্বীকারই করেছেন আমরা তাদের অকপট সাধুতার জন্য তা'গিদকে বোকা ভেবে হাস্য করি, কিন্তু আমরা ভেবে দেখি না যে, আমাদের রুক্ষ ও কোপন-স্বভাব এবং আত্মসম্মানের অভাবের জন্য আমরাও তাদের চোখে সমান নিন্দনীয়। আমাদের অশিষ্টতা ও অতি ব্যস্ততা আমাদিগকে ঘড়ির কাঁটার মত গোলাম করে ফেলেছে, তাদের কাছে এটি কেবল অসভ্যতা নয়, তারা এটাকে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অপমানকর মনে করে। মুসলমানদের সহৃদয় আতিথেয়তা, নির্দোষ রসিকতা ও শান্ত সামাজিক আনন্দ-অনুষ্ঠান থেকে কি আমাদের কিছুই শেখবার নেই? মানব-চরিত্রের এই সুকুমার বৃত্তিগুলির আমাদের মধ্যে ক্রমশ অভাব দেখা যাচ্ছে। সামান্য তাম্বুর ভিতরে অথবা মাটির কুঁড়ে ঘরের মধ্যে জীবনের যে আনন্দময় দিনগুলি কেটে যায়, যে শুদ্ধ আত্মার ও উচ্চ মর্যাদার পরিচয় মেলে, সেগুলি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমাদিগকে তার আস্বাদন লাভ করতে হবে।

মুসলিম চরিত্রে আর একটা লক্ষ্যণীয় দিক আছে—একটা আদর্শ নিয়ে নানাভাবে তার অনুশীলন করে জীবন-সুধা আহরণ করবার অকুণ্ঠ উৎসাহ ও শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও জীবনে পূর্ণ সুখ ভোগ করবার ক্ষমতা মুসলমানের আছে। খ্রিস্টানদের সঙ্গে তুলনায় এখানে মুসলমানদের অনেক সীমারেখা আছে সত্য, কিন্তু জীবনকে মাধুর্যময় ও বৈচিত্রময় করে তুলতে এবং তার মধ্য দিয়েই মানবতার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টাকে ইসলাম ব্যাহত বা রুদ্ধ করে নি। একজন অতি সাধারণ মুসলমান তার দারিদ্র ও অজ্ঞতা সত্ত্বেও তার ক্ষুদ্র ও অতি তুচ্ছ পরিবেশের মধ্যে জীবনে যে অনাবিল আনন্দ ও তৃপ্তি ভোগ করতে পারে, তা সত্যিই তার ইউরোপবাসী বহুগুণে বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত কুটনৈতিক জ্ঞান-সম্পন্ন ভাইকে লজ্জা দিতে পারে। ইয়ং সাহেবের ভাষায়, ইউরোপবাসীর চোখে মুসলমানদের এই স্বভাবকে তাদের কিসমত বা অদৃষ্টবাদিতার দোষ বলা যেতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। মুসলমানের ক্ষুব্ধ মন তার শাস্ত্রীয় বাধা ও নিষেধ অতিক্রম করে চিরন্তন দুঃখ-শোকের আসল কারণ উদ্ঘাটন করতে চাইলেও তাদের কালচার আধুনিক বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত পৃথিবীতে তাদের সুমহান পয়গম্বরের ভাষায় এই শিক্ষাই দান করে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি যে, আমি যে অবস্থার মধ্যেই থাকি না কেন তাতেই আমার পূর্ণ সন্তোষ। আধুনিক ইউরোপ এ-শিক্ষাটি গ্রহণ করলে মানবতার প্রকৃত কল্যাণই সাধিত হবে।

যেসব গ্রন্থ থেকে বিশেষ সাহায্য নেয়া হয়েছে

Ali, Syed A.—Spirit of Islam.

Arnold, T. W,—Preaching of Islam.

Mez, Adam,—Renaissance of Islam (Eng. tr. by S. K. Bukhsh & D. S. Margoliouth.)

Arnold & Guillaume, Eds—Legacy of Islam.

Bukhsh, S.K.—Studies, Indian and Islamic.

Leonard, A. G.—Islam, her Moral and Spiritual Value.

Faris, N. A, Ed.—The Arab Heritage.

Nicholson, R. A.—Literary History of Arabia.

Shustary, A. M. A.—Outlines of Islamic Culture, 2 vols

Hell, J,—The Arab Civilisation (tr. by S. K. Bukhsh.)

Hitti, P. K.—History of the Arabs.

Young, T. C—Christendom's Cultural Debt to Islam, in Muslim World, Vol. XXXV, April 1945.

গ্রন্থখানা সম্পর্কে অভিমত

গত পনের ষোল বৎসর ধরিয়া আমি আবদুল মওদুদের লেখার সহিত সুপরিচিত। আধুনিক মোছলেম বাঙলার তমদ্দুনী ও তাহজিবী রেনেসাঁ প্রবর্ত্তনে যে-কয়জন মোছলেম চিন্তানায়ক সাধনা করিতেছেন, আবদুল মওদুদ নিঃসন্দেহে তাঁহাদের মধ্যে একজন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি আরবী ও এছলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার দ্বারা বিশ্ব-সংস্কৃতি উন্নতির পথে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে উপযুক্ত নজীর দ্বারা নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া সে-সব তিনি বিষদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙালী মুছলমান এক যুগ-সন্ধিক্ষণের সম্মুখীন—তাহার ভবিষ্যৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন রূপায়িত হইবে তাহার পূর্ব্বতন স্বধর্ম্মীদের কীর্ত্তিকলাপ ও সাধনার ভিত্তিমূলে। এই হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থখানি অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে এবং আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ
১২.৪.৪৭


ISBN : 978 984 91468 0 3
9 789849 146803